সচিত্র

নারী-রত্ন-মালা

ভগিনী ডোরা, তরুদত্ত, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, রাণী লুইসা, ভিক্টোরিয়া, ফ্রাই, মেরী কার্পেণ্টার, রমা বাই, রীড্‌লী, গ্রেস্ ডার্লিং, বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী, সেলিনা ও সুসানার সংক্ষিপ্ত জীবনী।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস প্রণীত।

কলিকাতা

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেসে

শ্রীললিতমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।
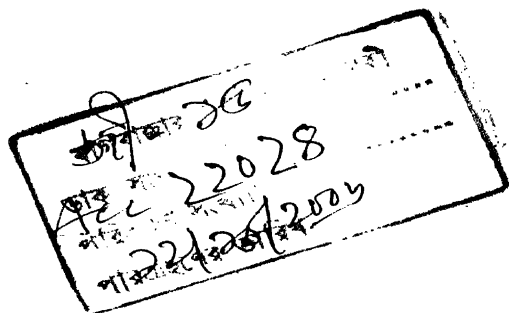
উৎসর্গ

পরম পূজনীয় ৺ কবীরবল্লভ দাস,

পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু—

বাবা!

প্রায় এক যুগ অতীত হইতে চলিল, তুমি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু আজও তোমার কথা ভুলিতে পারি নাই। তোমার সেই সুন্দর মুখশ্রী, সরল ব্যবহার, স্নেহমাখা সুমিষ্ট বাক্য ও অটল ধর্ম্মানুরাগের কথা আজও আমার প্রাণে অঙ্কিত আছে। প্রতিদিন অপরাহ্নে তুমি যে বিশেষ অনুরাগের সহিত রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিতে করিতে সীতার পতিভক্তি, ভীষ্মের ত্যাগ-স্বীকার, একলব্যের গুরুভক্তি, রাম-লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভাব, বিদুরের ধর্ম্মনিষ্ঠা, যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণ-ভক্তি প্রভৃতি সাধু সাধ্বীদের কীর্ত্তি-কাহিনী বর্ণন করিতে করিতে কাঁদিয়া আকুল হইতে, এবং তাঁহাদের পুণ্যময় জীবন স্মরণ করিয়া আমাদিগকে স্বীয় স্বীয় জীবনের উন্নতি সাধন করিতে অনুরোধ করিতে, তাহা আমরণ অন্তরে জাগরুক থাকিবে। যদি কণিকা পরি-

মাণেও আমার সাধু-ভক্তি হইয়া থাকে, তবে তাহা তোমারই শিক্ষা এবং আশীর্ব্বাদের ফল।

শুনিয়াছি, পিতামহ মহাশয় তোমার ধর্ম্মভাবের বিশেষ পরিচয় পাইয়াই পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সাধু কবীরের নামে তোমার নামকরণ করিয়াছিলেন। তুমি সাধু—আজ তাই স্বর্গবাসী। আমি তোমার সন্তান হইয়াও আঁধারে বিচরণ করিতেছি। তুমি সর্ব্বদা বলিতে—"সাধু জনের প্রতি ভক্তি রাখিও, ধর্ম্মলাভ হইবে।" তোমার সেই পবিত্র আদেশ কথঞ্চিৎ পরিমাণে প্রতিপালন করিতে গিয়া এই "নারী-রত্ন-মালা" লাভ করিয়াছি। আমি জানি, এ সামগ্রী আর কাহারও নিকটে ভাল না লাগিলেও তোমার নিকটে লাগিবে। তুমি যখন ইহলোকে ছিলে, তখন আমার প্রদত্ত সামগ্রী কত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে। আজ বহু যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিয়া এই "নারী-রত্ন-মালা" আনিয়াছি। স্বর্গ হইতে ইহার প্রতি একবার স্নেহচক্ষে নিরীক্ষণ কর, তোমার এ দীনসন্তান কৃতার্থ হইয়া যাইবে। ইতি—

তোমার স্নেহ-ভিখারী,
বৈকুণ্ঠনাথ।

সূচনা।

নারীজাতি ভুবনোদ্যানে কুসুম সদৃশ। মানুষ যখন ঘটনাবর্ত্তে পড়িয়া নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন ইহাদেরই সুকোমল আশ্রয় লাভ করিয়া একটুকু শান্তি পায়। নারীজাতি না থাকিলে এ বসুন্ধরা দুঃখে পূর্ণ হইত। নারী গৃহের লক্ষ্মী ও পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ। দীনজনের প্রতি দয়া, সাধারণের প্রতি সপ্রেম ব্যবহার, অপরের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ, প্রভৃতি সদ্‌গুণ নারীজাতির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। আমি যখন নিম্নলিখিত পুণ্যবতীগণের জীবন-কাহিনী পাঠ করিতে আরম্ভ করি, তখন ইঁহাদের অসাধারণ প্রেম এবং দয়ার পরিচয় পাইয়া দুই এক দিন নীরবে অশ্রুমোচন না করিয়া থাকিতে পারি নাই। পরের জন্য এই প্রকারে কেহ আপনার সুখ বিসর্জ্জন করিতে পারে কিনা জানিতাম না। আমি যখন নিজে এই প্রকার আনন্দ-সম্ভোগ করিতেছিলাম, তখন জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমার মনোগত ভাব অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"বঙ্গভাষায় এই প্রকার গ্রন্থ নাই বলিলেই হয়। আপনি যদি এই পুণ্যবতীদের জীবনী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন, তবে বঙ্গবাসীর, বিশেষতঃ বঙ্গনারীর বিশেষ কল্যাণ হয়।" বন্ধুবরের কথা আমার নিকটেও যুক্তিযুক্ত বোধ হওয়ায় আমি এই পবিত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। বস্তুতঃ বঙ্গভাষায় এই প্রকার আদর্শ-নারী চরিত্র অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে যাহাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতার এবং একদেশদর্শিতার ভাব না থাকে, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি। যাহাতে পাঠক পাঠিকাগণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিকাশ পায়, সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয়, আত্মত্যাগের ভাব প্রবল হয়, তজ্জন্য প্রচুর পরিমাণে যত্ন ও চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। উপনিষদের টীকাকার শ্রীযুক্ত সীতানাথ

দত্ত মহাশয় পুস্তকের পাণ্ডুলিপির স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়া এবং সিটি কলেজের অন্যতম শিক্ষক ও "মাতৃভক্তি ও মাতৃপূজা" রচয়িতা ভক্তিভাজন সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও "হাসি ও খেলা" রচয়িতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় দ্বয় অশেষ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক প্রূফ্ সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় সহোদর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে আমি ভগবতী-চরিত প্রকাশ করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। তজ্জন্য ইঁহার কাছেও কৃতজ্ঞ থাকিব। বিদেশীয় জীবনী সমূহ "The Excellent Women", "Picture Stories of Noble Women", "Noble Women" এবং "Extraordinary Women" নামক গ্রন্থাবলী অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে।

ইহাতে অস্মদ্দেশীয় নারীগণের জীবনীর সংখ্যা অপ্রচুর বলিয়া কেহ কেহ ক্ষুন্ন হইতে পারেন; কিন্তু এতদ্দেশীয় নারীগণের জীবন-কাহিনী সংগ্রহ করা কি দুরূহ ব্যবহার, তাহা হয়তঃ অনেকেই জানেন না। অনেক চেষ্টা করিয়াও এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। যদি সাধারণের উৎসাহ পাই, তবে ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে এতদ্দেশীয় নারীগণের জীবনী প্রচারে বিশেষ চেষ্টা করিব। পুস্তক খানি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছি; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। যদি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কাহারও উপকার হয়, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

কলিকাতা
১লা পৌষ, ১৩০২ সাল।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস।

সূচী।

ভগিনী ডোরা।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত ইয়র্কসায়ারের নিকটবর্ত্তী হাক্স-ওয়েল নামক স্থানে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জেম্‌স্‌ প্যাটিসনের গৃহে ডোরার জন্ম হয়। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ডোরথী উইণ্ডলো। পরে তিনি ভগিনী ডোরা নামে অভিহিত হন।

ডোরা বাল্যকালে বড়ই রুগ্না ছিলেন। শরীর অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল থাকায় তাঁহাকে পড়া শুনা করিতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ডোরা অলসের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন না। তিনি দেখিয়া শুনিয়া অপরাপর পড়ো ছেলে মেয়েদের চাইতেও বেশী শিখিয়াছিলেন। বাল্যকালেই তাঁহার বাক্যে ও স্বভাবে মিষ্টতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। রুগ্নাবস্থায় অপরাপর লোক যে প্রকার খিট্‌খিটে হয়, ডোরা তেমন হন নাই। বরং সেই সময় তাঁহার স্বভাব আরও নম্র এবং মিষ্ট হইয়াছিল।

ভগিনী ডোরা।

এক দিকে তাঁহার স্বভাব যেমন কোমল ছিল, অপর দিকে তেমনি প্রতিজ্ঞার বল ছিল। যাহা ধরিতেন, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞার সম্মুখে যদি সংসারের সমস্ত বাধা বিপত্তি আসিয়াও দাঁড়াইত, তথাপি তিনি ভয় পাইতেন না।

বাল্যকালেই তাঁহার এই দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। একদিন রবিবারে ভজনালয়ে যাইবার সময়, তাঁহার মাতা তাঁহাকে ও তাঁহার অপর একটী ভগিনীকে দুটী পুরাতন টুপী পরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। পুরাতন টুপী পরিতে ভগিনীদ্বয় যৎপরোনাস্তি আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণা জননী কন্যাদ্বয়ের জেদ রক্ষা করা আবশ্যক মনে করিলেন না। তিনি তাঁহাদিগকে সেই টুপীই পরাইয়া লইয়া গেলেন। বাড়ীতে আসিয়া ডোরথী ও তাঁহার ভগিনী মাকে জব্দ করিবার জন্য মায়ের অজ্ঞাতসারে টুপী দুটী জলে ভিজাইয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখেন। কিছুকাল পরে সেই টুপী দুটী একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কর্ত্তব্যপরায়ণা জননী অবশেষে কন্যাদ্বয়ের মন্দ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ঐ পচা টুপী পরাইয়াই কয়েক সপ্তাহ তাহাদিগকে গির্জ্জায় লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি এই প্রকার শিক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ডোরথীর জীবন-সৌন্দর্য্যে আজ পৃথিবী মুগ্ধ!

ডোরথী বড় কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। তিনি সামান্য সামান্য বিষয়ে এত হাসাইতে পারিতেন, যে হাসিতে হাসিতে যেন শ্রোতাদিগের নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইত! অতিশয় শোকাকুল ও রাগান্ধ ব্যক্তিও তাঁহার কৌতুকে না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। পরের উপকার করিবার প্রবৃত্তি শৈশবেই তাঁহার প্রাণে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তিনি আপন সহোদরাকে সঙ্গে লইয়া গ্রামস্থ গরিব দুঃখীদের বাড়ীতে প্রায় সর্ব্বদাই নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য বিতরণ করিতেন। গরিব দুঃখী দেখিলেই ধরিয়া আনিয়া আহার করাইতেন। কোন দিন যদি কোন অভুক্ত আতুর উপস্থিত হইত, আর তাঁহার নিকট অন্য খাদ্য না থাকিত, তবে নিজের মুখের গ্রাস তুলিয়া তাহাকে দিতেন। তিনি অপরাপর

মেয়েদের ন্যায় পুরাতন ছিন্ন বস্ত্রগুলি ফেলিয়া দিতেন না। সেগুলি যত্নপূর্ব্বক সেলাই করিয়া নিজে পরিধান করিতেন, এবং নববস্ত্রের জন্য যে অর্থ পাইতেন, তাহা প্রফুল্লমনে গরিব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। এই প্রকার দান করিয়া ডোরথী যে কি সুখানুভব করিতেন, অর্থলিপ্সু স্বার্থপর নরনারী তাহার মর্ম্ম কি বুঝিবে ?

ডোরার বয়স যখন ঊনত্রিশ বৎসর, তখন তিনি এক দিন শুনিতে পাইলেন, কুমারী নাইটিঙ্গেল অনেক গুলি সদাশয়া মহিলাসহ রুষিয়ার অন্তর্গত ক্রিমিয়ার ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে গিয়াছেন। এই সমাচার ডোরথীর প্রাণে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চালিত করিয়া দিল। তিনি তথায় যাইবার জন্য নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে ক্রিমিয়ায় পাঠাইয়া দিবার জন্য পিতাকে ধরিয়া বসিলেন। প্যাটিসন তাঁহার সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না, এবং বুঝাইয়া বলিলেনঃ—"কি প্রকারে আহত সৈনিকদিগের সেবা করিতে হয়, তুমি তাহার কিছুই জান না। এমতাবস্থায় কেবল ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া সেই ভীষণ স্থানে যাওয়া কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে। তুমি যদি সেই গুরুতর কার্য্যের উপযুক্ত হইতে, আমি আনন্দের সহিত তোমাকে সেই স্থানে পাঠাইয়া দিতাম।" অনুগতা ডোরথী পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না। কাজেই তাঁহাকে ক্রিমিয়ায় যাওয়ার সঙ্কল্প একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল।

ডোরথীর জননী চিররুগ্না ছিলেন। ক্রিমিয়ায় যাওয়ার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করার পর, ডোরথী প্রাণপণে জননীর সেবা করিতে লাগিলেন, কিন্তু জননীকে বাঁচাইতে পারিলেন না। মাতার মৃত্যুর পর ডোরার প্রাণ বড়ই উদাস হইয়া পড়িল। সংসারের যাবতীয়

বিষয়ে তাঁহার কেমন এক বিরাগ উপস্থিত হইল। নরসেবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সীমাবদ্ধ সাংসারিক কার্য্যে তিনি কিছুতেই আর আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিলেন না। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, বিশ্বজনীন সেবাধর্ম্ম তেমনি তাঁহার প্রাণকে টানিয়া লইল। এই সময় তিনি একবার রেড্কার নগরে বেড়াইতে যাইয়া তত্রত্য ভগিনী-সম্প্রদায়ের সহিত পরিচিত হন। এই সম্প্রদায়-ভুক্ত মহিলাগণ অবিবাহিত থাকিয়া ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে হাঁসপাতাল সংস্থাপন পূর্ব্বক অনাথ আতুরদিগের সেবা করিতেন। ডোরার অবসন্ন কোমল প্রাণ ভগিনীগণের সাধু দৃষ্টান্তে গলিয়া গেল; তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে তিনি নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সত্বর পিতার কাছে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা নানা প্রকার বাধা বিঘ্নের কথা উল্লেখ করিয়া সেই বিপদসঙ্কুল কার্য্যে তাঁহাকে কিছুতেই যাইতে অনুমতি দিলেন না।

কিছুকাল পরে ডোরা উলষ্টোন্ নগরে কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদ পাইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। স্বল্পদিনের মধ্যেই তথাকার ছাত্রীবর্গ, অভিভাবকও অন্যান্য নরনারীগণ তাঁহার চরিত্রে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি সেখানে পীড়িত শিশু-দিগের সেবা করিতেন এবং অবসর পাইলেই তাহাদের পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে নানাবিধ সুপরামর্শ দানে কৃতার্থ করিতেন। স্কুলে যৎসামান্য বেতন পাইতেন, তদুপরি তাঁহার পিতাও কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। প্রয়োজনীয় ব্যয় ব্যতীত চারি আনার পয়সা মাত্র হাতে রাখিয়া, অবশিষ্ট অর্থ তিনি গরিব দুঃখীদের সাহায্যার্থে ব্যয় করিতেন। ডোরথী

সমস্ত দিন স্কুলের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, এবং রাত্রি হইলে বাড়ী বাড়ী ঘূরিয়া পীড়িত নরনারীর সেবা করিতেন। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমে কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি সেই ভগ্ন শরীর লইয়াই খাটিতে লাগিলেন। এক দিন শয্যায় শয়ন করিয়া আর উঠিতে পারিলেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মেরু-দণ্ডে দারুণ ব্যথা হইয়াছিল। অবশেষে তিনি ডাক্তারের অনুরোধে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত রেড্‌কার নগরে ভগিনীদিগের হাঁসপাতালে চলিয়া গেলেন। ডোরথী এইবার সর্ব্ববিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভগিনী-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। এই সময় হইতেই তিনি ভগিনী ডোরা নামে অভিহিত হন।

ডোরা ভগিনী-সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য ভগিনী-দের সহিত তাঁহার প্রাণের ভাব মিলিল না। কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য প্রকাশ করাতে, তাঁহারা ওয়ালশল্ নামক স্থানে এক নব প্রতিষ্ঠিত হাঁসপাতালের কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। এই স্থানটী কয়লা ও লৌহ খনিতে পূর্ণ ছিল। এই কয়লা বা লৌহ খনিতে এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী কার্য্য করিত। ভূগর্ভে কার্য্য করিতে গিয়া যে সকল নরনারী আহত হইত, তাহারাই ঐ হাঁসপাতালে প্রেরিত হইত। এই স্থানের অধিবাসিগণ বড়ই দুর্নীতি পরায়ণ। তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন করিত বটে, কিন্তু সুরাপানেই অধিকাংশ অর্থ উড়াইয়া দিত। যাহাহউক তাহাদের এই একটী গুণ ছিল যে, তাহারা প্রাণান্তেও উপকারীর কোন অনিষ্ট করিত না।

ওয়ালশল হাঁসপাতালের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার কয়েক দিন পরেই, ডোরথী নিদারুণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলেন। ডাক্তারেরা

তাঁহাকে তজ্জন্য হাঁসপাতাল বাটিকার একটি ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। সকল দেশেই কুসংস্কারাপন্ন নরনারী আছে। ডোরাকে আবদ্ধ করিয়া রাখায় স্থানীয় লোকের মনে অন্য প্রকার ভাব উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে একজন, এই বদ্ধগৃহে যিশু-জননী মেরীর পূজা করা হইতেছে বলিয়া প্রচার করাতে স্থানীয় লোক ক্ষেপিয়া উঠিল এবং সেই গৃহে সকলে ঢিল ছুড়িতে লাগিল।

কয়েক দিন পর ডোরা আরোগ্য লাভ করিলেন। সেই স্থানের দুষ্ট লোকেরা ভগিনীদিগকে অত্যন্ত বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত। একদিন ডোরা একটি রোগীকে দেখিবার জন্য গ্রামের অভ্যন্তর দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় একটী দুরন্ত বালক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া "ওই রে এক ভগিনী আসিতেছে" এই বলিয়া একখানি পাথর তাঁহার মাথার দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিল। সেই ভীষণ আঘাতে ডোরার মস্তক কাটিয়া অবিরল ধারে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। তিনি তজ্জন্য একটী কথাও তাহাকে না বলিয়া আপন কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে, সেই বালকটী কোন কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া ডোরার হাঁসপাতালেই আসিল। তিনি একবার যাহাকে দেখিতেন, তাহাকে আর কখনও ভুলিতেন না। বালকটী যখন হাঁসপাতালে প্রবেশ করিতেছিল, তখনই তিনি তাহাকে চিনিতে পারিয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিলেন,—"আমি যাহাকে চাই, এতদিনে তাহাকে পাইয়াছি।" কিন্তু ডোরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই বালকের কাছে একটী কথাও উল্লেখ করিলেন না। তিনি আপনার সন্তানের ন্যায় তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। বালকটী যখন প্রায় সুস্থ হইয়া আসিল, তখন

একদিন ডোরা দেখিলেন যে, সে নীরবে কাঁদিতেছে! তিনি বুঝিলেন, বালক পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য কাঁদিতেছে। তিনি তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে আদর করিয়া কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে তখন আর সেই উচ্ছ্বসিত বেগ থামাইয়া রাখিতে পারিল না। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল ঃ—"ভগিনি! আমি সেই অভাগা বালক, যে আপনার মাথায় পাথর ছুড়িয়া মারিয়া ছিল।" ডোরা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বাছা! তুমি কি মনে কর, আমি তোমায় চিনিতে পারি নাই? তুমি যখন হাঁসপাতালে প্রবেশ করিতেছিলে, তখনই আমি তোমাকে চিনিয়াছিলাম।" বালক এই কথা শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিল ঃ—"কি আপনি আমায় চিনিতে পারিয়াও এমন ভাবে সেবা করিয়াছেন?" যে অহেতুক প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া ডোরা এই কার্য্য করিয়াছিলেন, অজ্ঞান বালক তাহার কি বুঝিবে?

ভগিনীগণ সময় সময় ডোরার উপর কাজের জন্য খুব চাপ দিতেন। বিছানাপাতা, রন্ধন করা, থালা বাসন পরিষ্কার করা প্রভৃতি কার্য্যও তাঁহাকে করিতে হইত। কোন দিন যদি শয্যা প্রস্তুত করিতে কোন প্রকার ক্রটী লক্ষিত হইত, তবে অন্যান্য ভগিনী তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। তখন ডোরা অশ্রুপূর্ণলোচনে সেই সকল পরিত্যক্ত বস্ত্রদ্বারা আবার শয্যাটী প্রস্তুত করিতেন। এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য হইতে তিনি এত সহিষ্ণুতা লাভ করিয়াছিলেন যে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

কিছুদিন পর ওয়ালশলে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। যে যেখানে সুবিধা পাইল, পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল; কিন্তু ভগিনী ডোরা সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও সেই পরিত্যক্ত অসহায়

রোগীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। একদিন রাত্রে একটী অসহায় রোগী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। তিনি ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, সেই অন্ধকার গৃহে একটী প্রদীপ মিট্ মিট্ করিতেছে, আর অন্যান্য পরিজন পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায় রোগীটী নিরুপায় হইয়া অপরিষ্কার দুর্গন্ধময় শয্যায় শুইয়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ বসন্তে পূর্ণ। পুঁজ ও রক্তে সমস্ত দেহ আর্দ্র। ভগিনী ডোরা এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। রোগী ভগিনী ডোরাকে দেখিয়া এত আনন্দিত ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, সে অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল এবং তাহাকে চুম্বন করিবার জন্য ডোরাকে অনুরোধ করিল। রোগীর কাতর বাক্যে ডোরা একেবারে গলিয়া গেলেন এবং কম্পিত দেহে তাহাকে কোলে তুলিয়া জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন। সেই দুর্ভাগ্য তাহার জীবনে কথনও এমন মধুমাখা স্নেহ পায় নাই। আজ এই অযাচিত স্বর্গীয় সুখে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল!

ডোরা অন্যান্য ভগিনীগণের ন্যায় সর্ব্বদা গম্ভীর ভাবে থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া থাকিত। একদা একজন লোক একটী গাধা লইয়া হাঁসপাতালে উপস্থিত হয়। সেই গাধার উপরে কেহ চড়িতে পারিত না। যে চড়িতে যাইত, গাধা তাহাকেই ফেলিয়া দিত। ডোরা বলিলেন, "আমি চড়িব, আমাকে ফেলিতে পারিবে না" এই বলিয়া তিনি বিনা জীনেই গাধার উপরে চড়িলেন। যেমন চড়া, অমনি গাধা কয়েক হাত দূরে তাঁহাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। সেই আঘাতে তাঁহার কোমরে খুব ব্যথা হয়। তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক দিন হামাগুড়ি দিয়া ভজনালয়ে যাইতে হইয়াছিল। তিনি এই ব্যাপারে এত দূর

লজ্জিতা হইয়াছিলেন যে, কাহারও কাছে ইহার বিন্দুমাত্রও উল্লেখ করিতেন না।

একদা একটী লোকের হাতে কোন প্রকার ক্ষত রোগ হওয়ায় সে ডোরথীর হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হইতে আসে। ডাক্তার বলিলেন, "ইহার হাতখানি কাটিয়া ফেলিতে হইবে, নতুবা কিছুতেই রক্ষা পাইবে না"। হাতখানি না কাটিয়া অন্য প্রকারে চিকিৎসা করিবার জন্য ডোরা অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ডাক্তার কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে ডোরা নিজের দায়িত্বেই তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ কিছু দিনের মধ্যেই সেই লোকটী আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল।

এইরূপে পোনের বৎসর কাল প্রাণপণে খাটিয়া ডোরার শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল। প্রথম প্রথম তাঁহার সহাস্য মুখ দেখিয়া কেহ তাঁহার রোগের পরিচয় পান্ নাই। অবশেষে তিনি যখন নিতান্ত অচল হইয়া পড়িলেন, তখন সকলে তাঁহার ক্ষয়কাশ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। রোগ যন্ত্রণা যখন প্রবল হইত, তখনও তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত। তাঁহার সেই-সময়কার অদ্ভুত সহিষ্ণুতা দেখিয়া সকলে যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে যে ক্ষতরোগাক্রান্ত ব্যক্তিটীর কথা বলিয়াছি, ভগিনী ডোরার অসুখের সময় সে প্রতিদিন ১১ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিত। ডোরার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই খুব জোরে ঘণ্টা বাজাইত। ঘণ্টা শব্দ শুনিয়া বাড়ী হইতে কেহ ছুটিয়া আসিলে, সে ডোরার শারীরিক সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিত—"ভগিনীকে

বলিও, তাঁহারই প্রদত্ত হস্তে (অর্থাৎ যে হস্তখানি তাঁহার চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়াছে) আমি এই ঘণ্টা বাজাইয়াছি !!" সেই কথা শুনিয়া মুমূর্ষু অবস্থাতেও ডোরার মুখে হাসির রেখা দেখা যাইত। রোগ যন্ত্রণার সময় তাঁহার জন্য যদি কোন বন্ধু দুঃখ প্রকাশ করিতেন, তিনি বলিতেন,—"আমি সংসারে একা আসিয়াছি, একা মরিব"। অতি শান্তিতে, ভগবানের নাম করিতে করিতে ১৮৭৪ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার প্রাণপাখী মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেল। গভীর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে বিদ্যুৎরেখা যেমন একমুহূর্ত্তে চারিদিক চমকিত করিয়া হঠাৎ নিভিয়া যায়, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ডোরথী উইণ্ডলোও তেমনি এ শোকদুঃখপূর্ণ সংসারে ক্ষণিক আলো দেখাইয়া অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। হায় ডোরা ! তোমার মত পুণ্যময়ী নারী আর কি আমরা দেখিতে পাইব না ?

কুমারী তরু দত্ত।

অরণ্যে কত ফুল প্রস্ফুটিত হয়, কে তাঁহার খোঁজ খবর রাখে ? বনফুল বনেই নীরবে প্রস্ফুটিত হয়, এবং অতি নীরবে আপন সৌরভ রাশি ছড়াইয়া যথাকালে ঝরিয়া পড়ে। এই প্রকারে, মানুষের অজ্ঞাত সারে, এ সংসার হইতে কত জীবন-কুসুম ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাহার সীমা নাই। কলিকাতা রামবাগানের দত্ত পরিবারের একটী বালিকাকুসুম কয়েক বৎসর

কুমারী তরু দত্ত।

পূর্ব্বে সুদূরবর্ত্তী ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে যে সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছিল, আজও তাহার সৌরভ বিলুপ্ত হয় নাই। এই বালিকাটীর নাম, কুমারী তরু দত্ত।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে রামবাগানের শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্তের গৃহে

তরুর জন্ম হয়। তরুর একটী ভগিনী ছিল, তাহার নাম অরু। যাহাতে যথোচিতরূপে দুহিতাদের শিক্ষা হয়, তজ্জন্য গোবিন্দ বাবু যথেষ্ট পরিমাণে যত্ন ও আয়োজন করিয়াছিলেন। অন্যান্য বালক বালিকারা স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সাধারণতঃ যে প্রকার উন্নতি লাভ করে, তরু গৃহে পড়িয়া তদপেক্ষাও উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। গোবিন্দ বাবু কন্যাদিগকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতেন। তরু ও অরু ফ্রান্সের কোন স্কুলে কয়েক মাসের জন্য নাম মাত্র পড়িয়াছিলেন। নতুবা তাঁহাদের কোন স্কুলে পড়া হয় নাই বলিলেই হয়। কিন্তু এই বালিকার কাছে, অনেক উপাধিপ্রাপ্ত নরনারীর মস্তকও নত হইয়াছে। "স্কুল কলেজে না পড়িলে যথোচিতরূপে শিক্ষালাভ হয় না," এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা এই বালিকার কথা স্মরণ করিয়া সে ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হউন।

গোবিন্দ বাবু ১৮৬৯ সালে যখন সস্ত্রীক ইউরোপে যান, তখন আপন দুহিতাদিগকেও লইয়া গিয়াছিলেন। আশানুরূপ শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তিনি তাঁহাদিগকে অত দূরদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। গোবিন্দ বাবু যে কয়েক বৎসর ইয়ুরোপে ছিলেন, তাহার অধিকাংশ সময়ই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে বাস করেন। তন্মধ্যে ইংলণ্ডেই অধিক। ফ্রান্সে অল্প কালের জন্য থাকিলেও,তরু ফ্রান্সকে বড় ভাল বাসিতেন। ফরাসীদের বিপদ আপদের কথা শুনিলে যেমন তরুর চক্ষু হইতে বারিধারা বিনির্গত হইত, তাহাদের সুখ সংবাদ পাইলে তিনি আবার তেমনি আনন্দিত হইতেন। তিনি ফরাসী ভাষা, ফরাসীদের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। তরু স্বল্প সময়ের মধ্যেই ফরাসী ও জর্ম্মান ভাষায় লিখিত রাশি রাশি কাব্য এবং উপন্যাস পাঠ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার

বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ মাত্র। একটী অল্প বয়স্কা বাঙ্গালী বালিকার পক্ষে তিন চা'র আলমারী ফরাসী ও জর্ম্মান পুস্তক পড়িয়া ফেলা কম গৌরবের কথা নহে। তিনি অনেক গুলি ফরাসী পুস্তক ইংরেজী ও বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। যে যে পুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ পুস্তকের মূল পর্য্যন্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তরুর স্মরণ-শক্তি অসাধারণ ছিল। বিবিধ পুস্তকের কঠিন কঠিন শব্দাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কোন গ্রন্থ পড়িতে হইলে, তাহার প্রত্যেক শব্দের প্রতি শব্দটী পর্য্যন্ত না জানিয়া ছাড়িতেন না। তিনি প্রথম প্রথম ইংরেজী গ্রন্থ পড়িতেন বটে, কিন্তু শেষ কালে ফরাসী ও জর্ম্মান গ্রন্থের ভিতরে দিবানিশি ডুবিয়াই থাকিতেন। তিনি ফরাসীদিগকে কত ভাল বাসিতেন, তাহা 'সখা' হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশটী পাঠ করিলেই সহজে বুঝা যাইবে।—"যখন ফ্রান্সের সহিত প্রুসিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ হইল, তখন তরু ইংলণ্ডে ছিলেন; তখন তাহার বয়স ১৫ বৎসর মাত্র। তখন তিনি তাঁহার দৈনিক বিবরণে লিখিয়াছিলেনঃ—"এক দিন বাবা মাকে সম্রাটের কথা কি বলিতেছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি গিয়া শুনিলাম ফরাসীরা হা'র মানিয়াছে। আমি তখন কি ভাবে আবার সিঁড়ি দিয়া উঠিলাম তাহা স্মরণ আছে; কে যেন আমার গলা চাপিয়া ধরিল, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁদ কাঁদ স্বরে অরুকে সকল কথা বলিলাম। ফ্রান্সের কেন পতন হইল? ইহার অনেক লোক পাপ ও নাস্তিকতায় ডুবিয়াছে—এই জন্য কি হে ফ্রান্স, তোমার পতন হইল! এই অবমাননার পর ঈশ্বরকে ভাল করিয়া পূজা ও সেবা করিতে শিখিও। দুর্ভাগ্য ফ্রান্স! তোমার জন্য আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।" ইহার কিছুকাল পরে ফ্রান্সের এই দুর্গতির কথা স্মরণ

করিয়া, তরু একটী উদ্দীপক কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই ছিল,—"ফ্রান্স মরে নাই, কিছু কালের জন্য মূর্চ্ছাগত হইয়াছে মাত্র। দেশের নরনারী তাহার সেবা করিলে, সে পুরাতন শক্তি লাভ করিয়া আবার জাগিবে।" ইহাতে ফ্রান্সের প্রতি তরুর যে অকৃত্রিম অনুরাগ এবং ঈশ্বরের উপর তাঁহার যে অটল ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

শুনা যায় অনেক শিক্ষিতা মহিলাই গৃহ কার্য্যে অশক্ত ও বীতস্পৃহ, কিন্তু তরু সে ধাতুর মেয়ে ছিলেন না। তিনি সংসারের কোন কর্ত্তব্য কার্য্যকেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন না। তিনি সাধ্যমত সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যেমন পিয়ানো বাজাইতে পারিতেন, তেমনি তাঁহার গলার স্বরও মধুর ছিল। তিনি পিয়ানো বাজাইতে বাজাইতে যখন গান করিতেন, তখন চারিদিক মধুময় হইয়া উঠিত। তাঁহার মৃত্যুর পরে গোবিন্দ বাবু বলিয়াছিলেন,—"তরুর মধুমাখা কণ্ঠধ্বনি আজিও যেন আমার কর্ণে তেমনি বাজিতেছে।"

ফ্রান্সে অবস্থান কালে তরু তদ্দেশীয় ভাষায় এক খানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল, সেই বই খানি অরুর অঙ্কিত চিত্রে চিত্রিত করিয়া বাহির করেন। কিন্তু ১৮৭৪ সালে অরুর প্রাণ-বিয়োগ হওয়ায়, সে আশা ফলবতী হয় নাই। কিছুকাল পরে জনৈক ফরাসী মহিলা সেই উপন্যাস খানি তাঁহার জীবনীসহ প্রকাশ করেন। একটী অল্প বয়স্কা বঙ্গবালার হস্ত হইতে ফরাসী ভাষায় এমন সুন্দর উপন্যাস বাহির হইতে দেখিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের তাবৎ লোক যৎ-পরোনাস্তি চমৎকৃত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু উপন্যাস অপেক্ষা পদ্য গ্রন্থেই তাহার কবিত্ব ও চিন্তাশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া

গিয়াছিল। ১৮৭৬ সালে গোবিন্দ বাবু তরুর এক খানি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের লোক এত দূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে, স্বল্প দিনের মধ্যেই সেই ৬।৭ টাকা মূল্যের কাব্য খানির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়।

১৮৮২ সালে "ভারত-গীতি-মালা" নামে আর একখানি পদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়; এই গ্রন্থেই তরুর প্রতিভাসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং ভারতের পণ্ডিত মণ্ডলী এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। একটী বঙ্গবালার ইংরেজী ভাষায় লিখিত কবিতাগ্রন্থ পাঠ করিয়া ইংলণ্ডের পণ্ডিতবর্গ প্রশংসা করিয়াছিলেন, এমন কি একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি সাহিত্য সমালোচক বলিয়াছেন যে, "এত অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত না হইলে তিনি ইংলণ্ডের জর্জ ইলিয়ট অথবা ফ্রান্সের জর্জ স্যাণ্ডের সমকক্ষ হইতে পারিতেন।" বঙ্গদেশ এবং দত্ত পরিবারের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

ইহার পর, ১৮৭৩ সালে, তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া সংস্কৃত অধ্যয়নে নিযুক্তা হন। বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাবলী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অধ্যয়ন কালে বিষ্ণুপুরাণের দুটী গল্প ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত করেন। তিনি ফরাসী ভাষায় লিখিত "প্রাচীন-ভারতনারী" নামক একখানি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু অকালে দুরন্ত কালের করাল গ্রাসে পতিত হওয়ায় তাঁহার সে সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। সংস্কৃত অধ্যয়ন কালে পরিশ্রমটা কিছু বেশীমাত্রায় করিতেন। তজ্জন্য তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং নানা প্রকার দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত

হয়। "প্রাচীন-ভারত-নারী" অনুবাদ করিতে করিতেই ক্ষয়কাশীতে তিনি শয্যাশায়িনী হন এবং ১৮৭৭ সালের ৩০শে আগষ্ট তারিখে একবিংশতিতম বর্ষে তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়। একদিকে তরুর জ্ঞান পিপাসা যেমন প্রবল ছিল, অপর দিকে, তেমনি তাঁহার প্রাণ দয়া, ধর্ম্ম ও বিনয়ে মণ্ডিত ছিল। পরের কষ্টের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইত এবং তিনি সাধ্যমত অপরের উপকার করিতে চেষ্টা করিতেন। যেমন তাঁহার বিনয় ছিল, তেমনি তেজস্বিতাও ছিল। কখনও কোন অসত্য কথা শুনিলে তাহার প্রতিবাদ না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। এমন কি সত্যের অনুরোধে অনেকবার তাঁহার পিতার সঙ্গেও তর্ক করিতে হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে যে সকল তর্ক উপস্থিত হইত, তাহার অধিকাংশ স্থলে পিতাই হারিয়া যাইতেন।

একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন—"মানুষের কাজের সমষ্টি দিয়া তাহার বয়স বিচার করিবে। যাঁহার কাজ যত বেশী, তাঁহার বয়সও সেই পরিমাণে বেশী মনে করিতে হইবে।" মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য যদিও বত্রিশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, তথাপি তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যের সমষ্টিতে তাঁহাকে একজন বয়স্ক লোক বলিয়া ভ্রম জন্মে। মহর্ষি ঈশা তিন বৎসরে যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সাধারণ মানব সমস্ত জীবনেও করিয়া উঠিতে পারে না। কুমারী তরু দত্তের পার্থিব জীবন একবিংশবর্ষ মাত্র ; কিন্তু এই অল্প কালের মধ্যে তিনি যে রূপ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকটে তাঁহার নাম যে চিরদিনের জন্য আদৃত থাকিবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।

উনবিংশ শতাব্দীর ঊষাকালে (১৮২০ সালে) ইটালির অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগরে প্রেমধর্ম্মের জীবন্তমূর্ত্তি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্ম হয়। ফ্লোরেন্সের পিতা উল্লিখিত নগরের একজন ধনবান্ ব্যক্তি, ইংলণ্ডেও তাঁহার প্রভূত সম্পত্তি ছিল। কর্ত্তব্য-পরায়ণ পিতার যত্ন ও চেষ্টায় ফ্লোরেন্স শৈশবেই সাহিত্য, গণিত ও সঙ্গীত-শাস্ত্র এবং আধুনিক বহুভাষায় আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

লোকে কথায় বলে, "গাছটী বড় হইলে কিরূপ হইবে, তাহা চারা গাছের দুটী পাতাতেই বুঝা যায়।" মনস্বিনী ফ্লোরেন্সের জীবনে এই প্রবাদ বাক্যটী অক্ষরে অক্ষরে সপ্রমাণ হইয়াছিল। পরকে সুখী করিবার স্পৃহা, তাঁহার বাল্যজীবনেই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। মনুষ্য হইতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রেম প্রসারিত হইয়া ছিল। কাহারও চক্ষে এক ফোঁটা জল দেখিলে, কাহারও মুখে একটী কাতরতা-সূচক 'হায়' ধ্বনি শুনিলে, কাহারও কোন কষ্ট যন্ত্রণা দেখিলে, দয়াবতী ফ্লোরেন্সের প্রাণে নিরতিশয় কষ্টানুভব হইত এবং চক্ষু হইতে অবিরল বারিধারা নির্গত হইত। একদিন

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।

ফ্লোরেন্স দেখিলেন. এক জন বৃদ্ধ রাখাল একটী খোঁড়া কুকুরকে লইয়া বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং, তাহার আরোগ্যের

আশা পরিত্যাগ করিয়া বড়ই কষ্টানুভব করিতেছে। কুকুরটীও যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। দয়াময়ী ফ্লোরেন্স এই দৃশ্য দেখিয়া ব্যাকুলভাবে তাড়াতাড়ি জল গরম করিয়া অতি যত্নে সেই ভগ্নপদে সেদ্‌ দিতে লাগিলেন এবং এক টুক্‌রা কাপড় জড়াইয়া ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিলেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই কুকুরটী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল দেখিয়া ফ্লোরেন্স আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ফ্লোরেন্সের বয়স যত বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার সেই অহেতুক প্রেম অধিকতররূপে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি যখন যে সময় টুকু পাইতেন, তাহা দরিদ্রের দুঃখমোচনে, পীড়িতের সেবাশুশ্রূষায় ও মৃত ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাটাইয়া দিতেন। কেহ কোন অভাবে পড়িলে, সাধ্যমত অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন।

ফ্লোরেন্স যখন একবিংশতিতম বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন মনোহর রূপের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় সেবাধর্ম্মও তাঁহার জীবনে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এই সময়ে তিনি প্রভূত ধন লাভ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে মনোমত পতি-গ্রহণ করিয়া সংসারের যাবতীয় সুখে সুখী হইতে পারিতেন। কিন্তু যাঁহার অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে সর্ব্বগ্রাসী প্রেম প্রবাহিত হইতেছে, তিনি কি সামান্য ঐহিক সুখভোগে রত থাকিতে পারেন? শৈশব জীবনে তাঁহার প্রাণে যে তান বাজিয়া উঠিয়াছিল, যৌবনের প্রারম্ভে তাহাই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার সমস্ত জীবন যৌবন ও ধন সম্পত্তি ভগবানের নামে ব্যথিতের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিলেন। তিনি সমগ্র ইয়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া শুশ্রূষা-প্রণালী শিক্ষা করিলেন। তৎপরে কোন হাঁসপাতালের শুশ্রূষাকারিণীর পদ লাভ করিয়া সেই শিক্ষাকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিলেন।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।

এই সময় ইউরোপের স্থানে স্থানে জ্বর ও বিসূচিকা রোগে মড়ক উপস্থিত হয়। দয়াময়ী ফ্লোরেন্স জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণমন ঢালিয়া মহামারীগ্রস্ত নরনারীদিগের সেবা করিতে লাগিলেন।

১৮৫৪ সালে রুষিয়ার সহিত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের এক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তজ্জন্য ২৫০০০ হাজার ইংরেজ সৈন্য ক্রিমিয়ায় প্রেরিত হয়। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে শত শত ইংরেজ হত ও আহত হইয়াছিল। আহতের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, দুই ক্রোশ ব্যাপী স্থান তাহাদের শয্যাতেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ইহাদের শুশ্রূষার্থে দেশস্থ নারীবৃন্দের নিকট এক আবেদন পত্র বাহির করেন। উহা পাঠ করিয়া ফ্লোরেন্স বিয়াল্লিস জন শুশ্রূষাকারিণীসহ প্রফুল্লচিত্তে সেই ভীষণ রণক্ষেত্রে গমন করিলেন। ফ্লোরেন্সের সাধু দৃষ্টান্তে অপরাপর মহিলারা এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, উল্লিখিত বিয়াল্লিস জন শুশ্রূষাকারিণীর মধ্যে অধিকাংশই উচ্চবংশীয়া মহিলা ছিলেন।

ফ্লোরেন্স সঙ্গিনীগণসহ যথাকালে কনষ্টাণ্টিনোপলের নিকটবর্ত্তী স্কুটারিতে উপনীত হইয়া যে ভীষণ দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, কাহারও হস্ত নাই, কাহারও বা পদ নাই, কেহ বা ক্ষতযন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে, কেহ বা কোন রূপে হামাগুড়ি দিয়া আপন অভীষ্ট পদার্থ গ্রহণ করিতেছে। ভালরূপ সেবা শুশ্রূষার বন্দোবস্ত নাই। যে সকল পুরুষেরা সেবা করিতেছে, তাহাদের ব্যবহারও অতীব মন্দ। আহতদিগের সকরুণ চীৎকারে চারিদিক পূর্ণ। কেহ বা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া "জল জল" করিতেছে, কেহ বা ক্ষুধায় চীৎকার করিতেছে, অথচ সেই দুর্ব্বিনীত কর্ম্মচারিগণ সে দিকে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। ফোরেন্স এই নরকের ছবি দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ফ্লোরেন্স হাঁসপাতালে প্রবেশ করিয়া সঙ্গিনী মহিলাদিগকে যথাযোগ্য স্থানে নিযুক্ত করিলেন। তিনি এবং অন্যান্য শুশ্রূষাকারিণীগণ সাদা টুপি ও গাউন পরিধান করিলেন। সকলের টুপির উপরে "স্কুটারী হাঁসপাতালের" নাম লিখিয়া দিলেন। ইতি পূর্ব্বে হাঁসপাতাল সমূহে পুরুষের দ্বারাই শুশ্রূষার কার্য্য সম্পন্ন হইত। তাহারা শুশ্রূষাপ্রণালী ভালরূপ জানিত না। এই জন্য রোগীদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিতে হইত। এখন সেই গুরুভার শান্তিরূপিণী নারীজাতির হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় শুশ্রূষার কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইতে লাগিল। রুগ্ন ও আহত ব্যক্তিগণ ইঁহাদের কোমল ব্যবহারে স্ত্রী, পুত্র এবং অন্যান্য পরিজনের অভাব বিস্মৃত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রুগ্ন ও আহতদের সংখ্যা গণনাতীত ছিল। শয্যাশ্রেণীর মধ্য দিয়া যাতায়াত করিবার জন্য উপযুক্ত পরিসরও ছিল না। সেই সুবিস্তৃত হাঁসপাতালের যে দিকে চক্ষু যাইত, কেবল অসংখ্য শয্যা ও রোগী ভিন্ন কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না। এই ভীষণ স্থানে ফ্লোরেন্স আপন সঙ্গিনীগণ সহ প্রাণপণে আহতদিগের সেবা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে নিদারুণ শীত আসিয়া উপস্থিত হইল। সেবাষ্টোপলে সৈনিকদিগকে যৎসামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া একটী সেঁতসেঁতে গৃহের মেঝের উপর শয়ন করিতে হইত। যথাকালে তাহাদের পথ্য জুটিত না, পেটে ঔষধ পড়িত না; এবং রীতিমত ক্ষতস্থান গুলি পরিস্কৃত করা বা বাঁধিয়া দেওয়াও হইত না। এই জন্য মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়িল। অল্পকালের মধ্যেই এই সকল দুর্ভাগ্য ব্যক্তিও ফ্লোরেন্সের সেবাধীন হইল। এখন নাইটিঙ্গেলের কার্য্য আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া রোগী দিগকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত যাহারা রোগ-

যন্ত্রণায় ক্রন্দন করিত, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দান, এবং হত ও আহত-দিগের বাড়ীতে চিঠি পত্র লেখা প্রভৃতি কার্য্যও তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইতে লাগিল। আহত ও রুগ্ন সৈনিকগণ দয়াময়ী ফ্লোরেন্সকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিত। তাহারা তাঁহাকে শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিলে রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া যাইত। রোগীরা অস্ত্র করিবার সময় ডাক্তার ও অন্যান্য শুশ্রূষাকারিণীর কথা অগ্রাহ্য করিত। কিন্তু যদি ফ্লোরেন্স অনুরোধ করিতেন, তাহা হইলে তাহারা বিন্দুমাত্রও আপত্তি করিত না। ভয়ঙ্কর দুর্দ্দান্ত সৈনিকগণ ফ্লোরেন্সকে সম্মুখে দেখিলে মেষশিশুবৎ হইয়া যাইত। কোন কোন সময়ে হাঁসপাতালে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত। কেহ ক্ষুধায় কাঁদিতেছে, কেহ তিক্ত ঔষধ পান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, কেহ বা অজ্ঞানাবস্থায়, ডাক্তার অঙ্গচ্ছেদন করিয়াছেন বলিয়া গালাগালি করিতেছে; কিন্তু ফ্লোরেন্স যেমনি গৃহে প্রবেশ করিতেন, অমনি সকলে চুপ্ করিত। ভীষণ অগ্নিকুণ্ড যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে উচ্ছ্বসিত জল প্রবাহে নিভিয়া যাইত। তাঁহার প্রেমের প্রভাব এমনি প্রবল ছিল।

একদিন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট হইতে আহত সৈনিকদিগের নামে একখানি চিঠি আসিল। উহার মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য সৈনিকগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ফ্লোরেন্স তাড়াতাড়ি সেই চিঠি-খানি অবিকল নকল করিয়া হাঁসপাতালের প্রতি গৃহে একখানি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। শুশ্রূষাকারিণীগণ পাঠ করিয়া সৈনিকদিগকে শুনাইলেন। সেই চিঠির মর্ম্ম এইরূপ ছিলঃ—"কুমারী নাইটিঙ্গেল এবং অন্যান্য সদাশয়া মহিলাগণ যেন প্রত্যেক আহত সৈনিককে জানান, যে তাঁহাদের স্বদেশানুরাগ, বীরত্ব এবং দুঃখের কথা তাঁহাদের রাণী কখনও ভুলিতে পারিবেন না। তিনি দিবানিশি তাঁহাদের দুঃখে ম্রিয়মাণ;

এবং তাঁহাদের সংবাদ পাইবার জন্য যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া থাকেন।" সৈনিকগণ এই সহানুভূতি লাভ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ-ধ্বনি করিয়া বলিল, "ঈশ্বর আমাদের মহারাণীকে রক্ষা করুন।"

গ্রীষ্মকালে শিবিরস্থ হাঁসপাতাল দেখিবার জন্য ফ্লোরেন্স অশ্বারোহণে ক্রিমিয়াভিমুখে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে জ্বররোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে ডুলি করিয়া কোনও নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় যাওয়ার পর জ্বর আরও বৃদ্ধি হইল। অনেক সেবা শুশ্রূষায় যখন একটুকু আরোগ্য লাভ করিলেন, তখন তাঁহাকে জোর করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "দুর্ভাগ্য সৈনিক-দিগের জন্য আরও যথেষ্ট করিবার আছে। আমি কোন্ প্রাণে তাহাদিগকে সেই আত্মীয় স্বজনহীন স্থানে নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া সুখে গৃহবাস করিব?" দয়াময়ীর দয়ার স্রোত প্রবাহিত হইল। আর কে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? তিনি সেই রুগ্নদেহেই আবার স্কুটারি হাঁসপাতালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৮৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেই প্রবল সমরানল নির্ব্বাপিত হইয়া শান্তি সংস্থাপিত হইল। তথাপি নাইটিঙ্গেল সেই স্কুটারি হাঁসপাতাল পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন না। অবশেষে ১৮৫৬ সালে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের তুরস্ক পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও দেশে ফিরিয়া আসেন। ইংলণ্ডবাসিগণ তাঁহাকে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দন দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিনয়ের সাক্ষাৎমূর্ত্তি নাইটিঙ্গেল আপনার অনুপযুক্ততা স্মরণ করিয়া সলজ্জবদনে ডার্ব্বিশায়ারস্থ ভবনে অতি নীরবে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের সাধারণ নরনারী, বিশেষতঃ আহত এবং অনাহত সৈনিকমণ্ডলী, তাঁহার এই মহৎ

কার্য্যের যৎসামান্য প্রতিদান স্বরূপ কোন শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ইংলণ্ডবাসী গুণের আদর করিতে জানেন। তাঁহারা এতদ্দেশীয় লোকের ন্যায় দীর্ঘসূত্রিতার বশবর্ত্তী হইয়া কোন প্রকার সৎকার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন করেন না। এই অসামান্য গুণেই সামান্য ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী হইয়াও ইংরেজজাতি সভ্যতার এত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমাদের দেশের লোক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, এই মহৎ কার্য্যের জন্য স্বল্প দিনের মধ্যেই পাঁচ লক্ষ টাকারও অধিক সংগৃহীত হইয়াছিল !!

এই অর্থ দ্বারা তাঁহার স্মরণার্থ অন্য কোন প্রকার সৎকার্য্য করার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু কুমারী নাইটিঙ্গেলের বিশেষ ইচ্ছা ও অনুরোধে লণ্ডন নগরস্থ সেন্ট্ টমাস্ হাঁসপাতালের সংস্রবে শুশ্রূষা-শিক্ষার্থিনীদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নাইটিঙ্গেলের হৃদয় কত মহৎ, কত সুন্দর ছিল, তাহা এই ঘটনাটীতেও জানা যায়। আমাদের মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া এই সাধু কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ফ্লোরেন্সকে একটী হীরক মণ্ডিত বস্ত্রবন্ধনী (Brooch) দিয়াছিলেন। তাহাতে এই কয়েকটী কথা লিখিত ছিলঃ—"ক্রিমিয়াতে আহত সৈনিকদিগের সাহায্যার্থে কুমারী নাইটিঙ্গেল যে মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক এই উপহারটী প্রদত্ত হইল।" তুরস্কের সুলতানও তাঁহাকে একজোড়া মণি মুক্তা খচিত বলয় উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮৫৮ সালে কুমারী নাইটিঙ্গেল "শুশ্রূষা-প্রণালী" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। যথারীতি শিক্ষা লাভ না করিয়া শুশ্রূষা করিতে গেলে যে কতদূর অনিষ্ট হয়, রোগীর পরিচ্ছদ, আহার ও বাসগৃহ

কিরূপ হওয়া উচিত, তিনি এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া...

১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষের সিপাহি বিদ্রোহের সময় অনেক ইয়ুরোপীয় সৈনিক ও কর্ম্মচারি আহত হইয়া নানা রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সেই দুঃসময়েও নাইটিঙ্গেল নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সুদূর ইংলণ্ড হইতেও তাহাদের শুশ্রূষার বিধান করিতেন! তাঁহার সেই সার্ব্বভৌমিক প্রেম জাতি বর্ণ বিশেষে আবদ্ধ নহে। যে যে উপায় অবলম্বন করিলে ভারতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে, তিনি সেই সেই উপায়গুলি অবলম্বন করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের নারী জাতির দুর্দ্দশার কথাও অনবগত নহেন। ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তা করিয়া থাকেন।

কিছুকাল তিনি হাঁসপাতালসংস্কারে নিযুক্ত ছিলেন। যাহাতে হাঁসপাতাল সমূহের গৃহ, পথ্য, পরিচ্ছদ ও বায়ু যথোপযুক্ত হয়, তিনি তজ্জন্য যথাসাধ্য খাটিয়াছেন। তৎপর অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। যখন তাঁহাকে নানা প্রকার রোগে আক্রমণ করিল, তখন লণ্ডনে চলিয়া আসিলেন, এবং দিবানিশি এক গৃহে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি এখন এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

প্রুসিয়ার রাণী লুইসা।

লুইসা ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মেনীতে জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহার বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হয়। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার শিক্ষার কোন ব্যাঘাত হয় নাই। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা পিতা-মহীর যত্ন ও চেষ্টায় তিনি নানা বিদ্যায় বিভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার শৈশবেই দীন দুঃখীর প্রতি অপার করুণার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বালিকা লুইসা অপরের দুঃখ দেখিলে না কাঁদিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। উপায়হীন রুগ্ন নরনারীকে দেখিলেই তিনি সাধ্য মত সেবা ও শুশ্রূষা করিতেন। যখন তাঁহার বয়স তের বৎসর, তখন একদিন কোন দুঃখিনী বিধবা তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিতে আসে। তিনি তাহার জীর্ণবস্ত্র ও শীর্ণকায় দেখিয়া প্রাণে নিরতিশয় কষ্টানুভব করেন; এবং তাঁহার যে সামান্য সঞ্চিত অর্থ ছিল, তাহার সমস্ত উল্লিখিত ভিখারিণীকে দান করেন। আর এক সময়ে তাঁহার পিতামহী এবং শিক্ষয়িত্রী তাঁহাকে না পাইয়া বড়ই চিন্তিত হন। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, লুইসা জনৈক অনাথা পীড়িতা বালিকার পার্শ্বে বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। লুইসার অভিভাবকবর্গ এবং

অন্যান্য পরিজনগণ তাঁহার এই মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া কত সুখী হইয়াছিলেন, তাহা লেখনীর বর্ণনাতীত।

স্বল্প দিনের মধ্যেই লুইসার যশঃসৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এমন কি প্রুসিয়ার রাজা তাঁহার অপরূপ রূপ লাবণ্য এবং

প্রুসিয়ার রাণী লুইসা।

নানা গুণের কথা শুনিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণেচ্ছু হন। অবশেষে ১৭৯৩ সালে, খ্রীষ্টের জন্মোৎসবের সময় তাঁহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন

হয়। সেই সময় বার্লিনে মহোৎসব হইয়াছিল। সমস্ত সহর নানাবিধ পুষ্প ও লতা দ্বারা সাজান হইয়াছিল। লুইসা যখন রাজপুরে প্রবেশ করেন, তখন জনৈক বালিকা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটী সুমিষ্ট কবিতা * আবৃত্তি করে। তিনি কবিতাটী শুনিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, কম্পিত দেহে বালিকাটীকে আলিঙ্গন করিয়া বারম্বার চুম্বন করিয়াছিলেন। তিনি যে প্রুষিয়ার রাণী, সেই সময় সে কথাটী ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বিবাহের কিয়দ্দিন পরে, রাজা রাণীকে লইয়া মহাসমারোহে একদিন রাজপথে বাহির হইতে ইচ্ছা করেন। দয়াবতী লুইসা সেই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, —"বৃথা এ অর্থব্যয়ের প্রয়োজন কি? যে অর্থ দ্বারা এই আমোদ প্রমোদ হইবে, তাহা বরং অনাথা বিধবা এবং পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকার জন্য ব্যয় করা হউক।" বিবাহ উপলক্ষে তিনি যে সকল উপহার পাইলেন, তাহার অধিকাংশ গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন। একটী যুবতী আপন আমোদ আহ্লাদের অর্থে গরিব দুঃখীর উপকার করিতে পারে, এ কথা বিষয়ী লোকের চিন্তার অতীত। লুইসার এই অসামান্য ব্যবহারে সমগ্র প্রুসিয়াবাসী যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

লুইসার বিবাহের পরবর্ত্তী জন্মদিনে তাঁহার স্বামী গ্রীষ্মকালে অবস্থিতির জন্য একটী সুন্দর প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়া দিয়া বলি-

* ইংরেজীঅভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাদের জন্য সেই কবিতাটীর শেষ অংশটুকু এই স্থানে উদ্ধৃত হইল ;—

—"Forget what thou hast lost ; this festal day
Foretells a fairer, brighter life for thee.
All hail ! unto the future times thou kings
Shalt give, of happy grandsons mother be !"

লেন ঃ—"তুমি এতদ্ব্যতীত আর কি চাও?" অমনি লুইসা বলিয়া উঠিলেন ঃ—"আমায় কিছু বেশী পরিমাণে অর্থ দেও, আমি গরিব দুঃখীদিগকে বিতরণ করিব"। রাজা আহ্লাদের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—"কত বেশী"? লুইসা বলিলেন ঃ—"একজন দয়ালু রাজার প্রাণখানি যত বড়, তত অর্থ চাই।" রাজা হাসিতে হাসিতে তন্মুহূর্ত্তে নবীনা রাণীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। গরিব দুঃখীরা প্রচুর পরিমাণে অর্থ লাভ করিয়া লুইসাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। লুইসা তাঁহার স্বামীসহ একবার পল্লীগ্রামে গিয়া কিছুকালের জন্য বাস করেন। সেই সময় তাঁহারা আপনাদের পদ-গৌরব ভুলিয়া দরিদ্র নরনারীদের সহিত সমান ভাবে মিশিতেন। তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া কত কথা বার্ত্তা কহিতেন। বাজার হইতে মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া তাহাদের বালক বালিকাদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। পথিমধ্যে কোন অনাথ বালক বালিকাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে লুইসা কোলে তুলিয়া লইতেন। যিনি প্রুসিয়ার রাণী, তাঁহার এমন ব্যবহার! পৃথিবীর কোন স্থানে এ স্বর্গীয় দৃশ্য দেখা যায় কি?

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে লুইসা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। ইনিই পরে প্রথম উইলিয়ম নামে অভিহিত হন এবং ইহাঁর দ্বারাই জর্ম্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান জর্ম্মান সম্রাট লুইসার প্রপৌত্র।

লুইসা অতি সামান্য ভাবে স্বামীসহ যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিতেন। তাঁহাদের বাহ্যিক পোষাক পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহার দেখিলে, কোন নবাগত ব্যক্তি তাঁহাদিগকে প্রুষিয়ার রাজা বা রাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিত না। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের মহামেলায় তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করিতেন, এবং সামান্য সামান্য সরাইয়ে আহারাদি

করিতেন। একদিন রাজা ও রাণীকে কোন সামান্য দোকানে জিনিস ক্রয় করিতে দেখিয়া, একটী মহিলা দূরে সরিয়া যাইতে ছিলেন। লুইসা তাঁহাকে এইরূপ ব্যাকুল দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন ;—"আপনি চলিয়া যাইতেছেন কেন? নিরুদ্বেগে আপনার আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করুণ। এই প্রকারে সমস্ত ক্রেতা যদি চলিয়া যায়, তবে বেচারী দোকানীর যে বিশেষ ক্ষতি হইবে।" পরে তিনি তাঁহার সমস্ত পারিবারিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, রাজকুমারের ঠিক সমান বয়েসী তাঁহারও একটী সন্তান আছে, তখন তিনি কতকগুলি মূল্যবান খেলনক ক্রয় করিয়া তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন,—"ভদ্রে! আশা করি এই যৎসামান্য উপহার আপনার সন্তানকে দিবেন।" রাজাও প্রজার সম্বন্ধ ভাবিলে সাধারণতঃ খাদ্য খাদকের কথা মনে পড়ে। কিন্তু লুইসা ও তাঁহার স্বামীরচরিত্র স্মরণ করিলে প্রাণে যুগপৎ সুখ, আনন্দ এবং অভূতপূর্ব্ব ভক্তি রসের সঞ্চার হয়।

লুইসা যখনই গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন, তখনই কিছু অর্থ, খেলনক এবং খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে করিয়া লইতেন। পথিমধ্যে কোন উপায়হীন লোক দেখিলেই অর্থ সাহায্য করিতেন, এবং বালক বালিকা দিগকে দেখিলে খেলনক ও খাদ্য সামগ্রী দিয়া সন্তুষ্ট করিতেন। যখন লুইসা শকটারোহণে কোন স্থানে যাইতেন, তখন দলে দলে লোক শকটের চারি পাশে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িত। শান্তিরক্ষক বহু চেষ্টা কারয়াও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিত না। পরে স্থানীয় শাসনকর্ত্তা আসিয়া বলিতেন, "মহারাণি! আপনি একবার গাড়ী হইতে অবতরণ করুণ। আপনাকে দেখিবার জন্য প্রজাপুঞ্জ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।" তখন লুইসা হাসিতে হাসিতে গাড়ী হইতে

অবতরণ করিতেন। প্রজাকুল আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া বলিত,—"পরমেশ্বর আমাদের মহারাণীকে দীর্ঘজীবী করুণ।" যদি নিকটে কাহারও বাড়ী থাকিত, তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া তৎপ্রদত্ত সামান্য খাদ্য গ্রহণ করিতেন। প্রজাকুল তাঁহার এই সকল সদ্ব্যবহারে এতদূর আনন্দিত হইত যে, তাহারা না কাঁদিয়া স্থির থাকিতে পারিত না। বিবাহিত হওয়ার পর লুইসা তাঁহার পিতামহীকে যে পত্র-খানি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই কয়েকটি কথাও ছিল,—"ঠাকুরমা! আমি রাণী হইয়া এখন গরিব দুঃখীদিগকে আশানুরূপ সাহায্য করিতে পারিতেছি বলিয়া আমার যে সুখ হইতেছে, এমন সুখ আর কিছুতেই হয় নাই।" দীন দরিদ্রের প্রতি লুইসার কি প্রগাঢ় প্রেম ছিল, তাহা ইহাতেই বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়।

পড়াশুনায় লুইসার গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁহার শৈশব হইতেই দৈনন্দিন লিপি লিখিবার অভ্যাস ছিল। তিনি অনেকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এমনি বিনয় ছিল, যে সেই-গুলিকে যৎসামান্য মনে করিয়া তাহা সাধারণ্যে প্রচার করিতে দেন নাই। তাঁহার কণ্ঠস্বর বড়ই মধুর ছিল। তিনি যখন কোন বিষাদ-গীতি গাইতেন, তখন অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হইত।

কিছুকাল পরেই লুইসার সুখরবি অস্তমিত হইল। ফ্রান্সের সহিত প্রুসিয়ার ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। প্রথম বারে যখন প্রুসিয়া পরাজিত হইল, তখন লুইসা মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া তাঁহার একাদশ-বর্ষবয়স্ক সন্তানকে বলিয়াছিলেন,—"বৎস! এখন আর আলস্যে কাল কর্ত্তনের সময় নাই। তরবারি গ্রহণ করিয়া স্বজাতি, স্বদেশ এবং পিতৃপুরুষের গৌরব রক্ষা কর।" দ্বিতীয় বার চেষ্টাতেও প্রুসিয়ার সর্ব্বনাশ হইল। নেপোলিয়নের অন্যায় আক্রমণে চারিদিকে হাহাকার

পড়িয়া গেল। লুইসা স্বদেশের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বার্লিন পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে গেলেন। সেই সময় তিনি সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করিয়া একস্থানে লিখিয়াছিলেন—"আমি যাহা ছিলাম, আবার তাহাই হইলাম। সংসারের সুখের পরিণাম ত এই! ভ্রান্ত মানব সংসারের সুখদুঃখের পরিবর্ত্তন অবগত হইয়াও কেন মোহান্ধ হয়?" কিছুকাল পরে তাঁহার ফুস্‌ফুসের ভিতরে প্রকাণ্ড একটা স্ফোটক হয়। তজ্জন্য তিনি বড়ই যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী এইকথা শুনিতে পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। স্বামীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া তিনি বলিলেন ঃ—"স্বামিন্! সংসারের সুখ ফুরাইল! ইহ জগতের অনিত্যতা স্মরণ করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হও। ঐ শুন, পিতা আমাকে ডাকিতেছেন। এখন বিদায়! বিদায়!" এই বলিতে বলিতে তাঁহার দেহপিঞ্জর শূণ্য হইল। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হয়। এই ২৩শে ডিসেম্বরই তিনি বিবাহিত হন! পরে প্রুসিয়া উদ্ধার হইয়াছিল বটে, কিন্তু লুইসা তাহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। লুইসা ৮০ বৎসর পূর্ব্বে প্রুসিয়াতে যে সৌরভ ছড়াইয়া ছিলেন, আজিও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই।

ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া।

যাঁহার সুশাসনে ভারতের সাতাশ কোটি লোক সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, যিনি একাধারে সুপত্নী, সুজননী, সুগৃহিণী এবং সুশাসনকর্ত্রী, তাঁহার পুণ্যকাহিনী শুনিতে কাহার না আকাঙ্ক্ষা হয়? যাঁহার উপরে কোটি কোটি নরনারীর সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে, তাঁহার গুণকাহিনী গৃহে গৃহে কীর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রাজা তৃতীয় জর্জ্জের চারি পুত্র। তন্মধ্যে এড্‌ওয়ার্ড সর্ব্বকনিষ্ঠ। এড্‌ওয়ার্ড নানা কারণে পিতা এবং পরিবারস্থ অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের স্নেহ হইতে বঞ্চিত থাকিলেও, দয়া ধর্ম্ম, সত্যনিষ্ঠা এবং বুদ্ধিমত্তার জন্য তিনি সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ভয়প্রদর্শন করিলেও তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না। একবার তিনি তাঁহার পিতার একটী সখের ঘড়ী ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কেহই জানিত না। যখন চারিদিকে অপরাধীর অনুসন্ধান হইতে লাগিল, তখন সত্যপরায়ণ এডওয়ার্ড ক্রোধান্ধ পিতাকে বলিয়াছিলেন—"আমি ভাঙ্গিয়াছি।" এক জন পারিষদ তাঁহার দোষ মোচনার্থে বলিলেন:—"রাজকুমার

অবশ্য ইচ্ছা করিয়া ঘড়িটী ভাঙ্গেন নাই; এবং যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষরূপে দুঃখিত আছেন।" নির্ভীক এড্ওয়ার্ড ইহা শুনিয়া

অতীব গম্ভীর স্বরে বলিলেন ঃ—"না, আমি ইচ্ছা করিয়াই ভাঙ্গিয়াছি; এবং তজ্জন্য এখন পর্য্যন্ত দুঃখিত হই নাই।" এই অপরাধে তাঁহাকে যদিও দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার সত্যনিষ্ঠায় সকলে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পিতা যথেষ্ট স্নেহ করিতেন না বলিয়া তিনি অতি সামান্য বৃত্তি পাইতেন, এবং সেই সামান্য অর্থেই প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যেও কিছু কিছু ব্যয় করিতে সক্ষম হইতেন। তিনি "ব্রিটিশ ও বৈদেশিক স্কুল সভা," "দাসত্ব-প্রথা-নিবারণী সভা" এবং "বাইবেল সভা"র নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি জিব্রাল্টারের সুরাপায়ী দুর্নীতিপরায়ণ সৈন্যদিগের মধ্যে সুনিয়ম এবং সুনীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া যে কি মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা লেখনীর বর্ণনাতীত। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মেনীর অন্তর্গত সেক্সকোবার্গসেলফিলড় অধিপতির বিধবা কন্যা ভিক্টোরিয়া মেরী লুইসার সহিত তাঁহার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মেরী লুইসাও বিবিধ গুণে বিভূষিতা ছিলেন। অতি অল্প রমণীই রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং রাজবধূ হইয়া, এরূপ আদর্শজীবন যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই ধর্ম্মপরায়ণ দম্পতিই আমাদের মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জনক জননী। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে কেনসিংটন প্রাসাদে তাঁহার জন্ম হয়। যে সকল গুণে মহারাণী আজ সর্ব্বসাধারণের পূজ্য হইয়াছেন, সেই সকল গুণের জন্য তিনি তাঁহার জনক জননীর নিকটই বিশেষ ঋণী।

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া শৈশবে এক বার আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এক দিন তিনি গৃহে নিদ্রা যাইতেছিলেন,

এমন সময় একটী লোক পাখী শিকার করিতে যাইয়া বন্দুক ছুড়িল। সেই বন্দুকের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গৃহের শার্শী ভেদ করিয়া রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার মস্তকের নিকট পতিত হইল। ধাত্রীর চীৎকারে ভৃত্যগণ এই ব্যাপার অবগত হইয়া সেই শিকারীকে ধরিয়া আনিল। এড্‌ওয়ার্ডের এমনি মহত্ব, তিনি ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইতে বলিয়াই তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন! ইহার অল্প দিন পরেই, রাজকুমার এড্‌ওয়ার্ড ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

ভিক্টোরিয়াজননী লুইসা স্বামীর অকাল মৃত্যুতে প্রাণে নিদারুণ আঘাত পাইলেন। তিনি কিঞ্চিৎ অধিক একবৎসরকাল মাত্র স্বামীর সহবাস করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই যে তাঁহার সুখরবি অস্তমিত হইবে, তিনি তাহা জানিতেন না। তিনি ভিক্টোরিয়াকে স্বদেশে লইয়া গেলে পরম সুখে কাল কাটাইতে পারিতেন; কিন্তু পতিপরায়ণা লুইসা স্বামীর পবিত্র অভিপ্রায়ানুসারে সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, রাজপরিবারের ঘৃণা বিদ্বেষ সহিয়াও, দুহিতাকে লইয়া ইংলণ্ডে রহিলেন। তিনি বিদেশীয়া, ভাল ইংরেজী জানিতেন না; এতদ্ব্যতীত যে যৎসামান্য বৃত্তি পাইতেন, তদ্দ্বারা প্রয়োজনীয় ব্যয় অতি কষ্টে নির্ব্বাহিত হইত। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও কন্যার হিতার্থে সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে, তৃতীয় জর্জ্জ ইহলোক পরিত্যাগ করেন; তৎপরে ডিউক অব ইয়র্কের পত্নী নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করেন। সুতরাং ইংলণ্ডের সিংহাসন ক্রমেই ভিক্টোরিয়ার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। ইহার কিছুকাল পরে ডিউক অব ক্ল্যারান্সের এক মাত্র কন্যারও মৃত্যু হওয়ায় ইংলণ্ডের সিংহাসন ভিক্টোরিয়ারই প্রাপ্য হয়। লুইসা দুহিতাকে এই গুরুতর কর্ত্তব্য ভারের উপযুক্ত করিবার জন্য তাঁহাকে

প্রাণপণে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ভিক্টোরিয়া তিন বৎসর বয়সে আর একটী বিপদ হইতে রক্ষা পান। এক দিন মায়ের সঙ্গে বেড়াইতে গিয়া গাড়ীর চাকার তলে পড়িয়া তাঁহার প্রাণনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু জনৈক সৈনিকের সাহায্যে রক্ষা পান। ভিক্টোরিয়ার শৈশব জীবন কেনসিংটন প্রাসাদেই অতিবাহিত হয়। এই খানেই লুইসা তাঁহাকে যথোচিত শিক্ষা দান করিতেন। ভিক্টোরিয়া যাহাতে অপরাপর রাজকন্যাদের ন্যায় বিলাসিনী হইয়া নানা প্রকার নীতিবিগর্হিত আমোদে যোগদান না করেন, লুইসা তদ্বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি নিজের এবং ভিক্টোরিয়ার পরিচ্ছদ ও আহারাদিতে অধিক ব্যয় করিতেন না। পাছে ভিক্টোরিয়া কুশিক্ষা পান, লুইসা সর্ব্বদা এই ভয়ে কাতর থাকিতেন এবং স্বয়ং তাঁহার শিক্ষার পর্য্যবেক্ষন করিতেন।

ভিক্টোরিয়ার সত্যানুরাগ শৈশবেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। পিতার ন্যায় তিনিও স্পষ্টরূপে সত্য কথা বলিতে ভীত হইতেন না। শিক্ষয়িত্রীকে বিরক্ত করার জন্য, তিনি এক দিন তিরস্কৃত হন। সে কথা লুইসার কর্ণে গেল। লুইসা সন্তানের দুর্ব্ব্যবহারের অনুসন্ধান করিতে আসিলে শিক্ষয়িত্রী বলিলেন—"রাজকুমারী একবার মাত্র আমাকে বিরক্ত করিয়াছিলেন।" অমনি ভিক্টোরিয়া বলিয়া উঠিলেন :—"একবার নহে, দুই বার।" কি অসাধারণ সত্যানুরাগ! শৈশবেই ভিক্টোরিয়ার মহজ্জীবনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে মেরী লুইসা অর্থকষ্টে পতিত হন। একে ত যে সামান্য বৃত্তি পাইতেন, তদ্দ্বারা প্রয়োজনীয় ব্যয়ই সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইত না, তাহাতে আবার এডওয়ার্ডের পরিত্যক্ত সম্পত্তির সঙ্গে তৎকৃত প্রচুর ঋণও জড়িত ছিল। স্বামীর ঋণ শোধের জন্য লুইসা সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া অর্থকষ্টে পতিত হন।

তাঁহার ভ্রাতা রাজা লিওপোল্ড সেই সময় সাহায্য না করিলে তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহই ক্লেশকর হইত। যিনি এখন বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী, তাঁহাকেও একদিন অর্থাভাবে কত ক্লেশ পাইতে হইয়াছে।

আত্মসংযম ভিক্টোরিয়ার শৈশবেই অভ্যস্থ হইয়াছিল। তিনি ঋণ করিয়া কখনও কোন সামগ্রী ক্রয় করিতেন না; এবং অপরকেও মিতব্যয়ী দেখিলে পরম সুখী হইতেন। একদিন দোকানে কোন জিনিস ক্রয় করিতে গিয়া দেখিলেন, জনৈক মহিলা একটী মূল্যবান হার কিনিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন,কিন্তু অর্থাভাবে কিনিতে পারিতেছেন না। অবশেষে এক ছড়া অল্পমূল্যের হার লইয়াই প্রস্থান করিলেন। ভিক্টোরিয়া এই ঘটনায় এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, সেই মূল্যবান হার ক্রয় করিয়া উল্লিখিত মহিলার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া লিখিয়াছিলেন, "আপনার দুরদর্শিতার পুরস্কার স্বরূপ এই ক্ষুদ্র উপহারটী প্রেরিত হইল।" ভিক্টোরিয়া একবার যাহা ধরিতেন, তাহা না শিখিয়া ছাড়িতেন না। একটী কার্য্য শেষ না করিয়া তিনি অপর কার্য্যে হাত দিতেন না। তাঁহার এমনি প্রতিভা ছিল যে, একাদশবর্ষ বয়সের মধ্যেই তিনি লাটিন, ফ্রেঞ্চ, গ্রীক এবং জর্ম্মণ ভাষা সুন্দররূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। গণিত, চিত্রবিদ্যা ও ইতিহাসের উপর তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সাধারণতঃ রাজদুহিতারা যেরূপ বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী হন, ভিক্টোরিয়া মায়ের গুণে তদপেক্ষা অনেক পরিমাণে বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে ভিক্টোরিয়া যখন একটুকু বড় হইলেন, তখন পার্লিয়ামেণ্ট হইতে তাঁহার শিক্ষার্থে প্রচুরপরিমাণে বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। বহুকাল পরে মেরী লুইসার অর্থকষ্ট দূরীভূত হইল। এইবার তিনি

মনের আনন্দে ও সুখে স্বচ্ছন্দে ভিক্টোরিয়ার শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আদর্শজননী মেরীর যত্ন, পরিশ্রম ও চেষ্টায় ভিক্টোরিয়া নানা গুণে মণ্ডিত হইলেন। এই জন্য তৎকালীন পণ্ডিতমণ্ডলী লুইসার যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

ভিক্টোরিয়া যে ইংলণ্ডের রাণী হইবেন, এ কথা তিনি একাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত জানিতেন না। পাছে কোন প্রকার বিলাসের ভাব আসে, অথবা ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রাণে কষ্টানুভব করেন, এই ভয়েই তাঁহাকে সেই কথা জানিতে দেওয়া হয় নাই। কিছু কাল পরে ভিক্টোরিয়া যখন শুনিলেন, তিনিই পরে এই বিশাল রাজ্যের অধিশ্বরী হইবেন, তখন বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া গম্ভীর স্বরে তাঁহার শিক্ষয়িত্রীকে বলিয়াছিলেন, "অনেকেই এই সংবাদে গর্ব্বিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহারা এই পদের গুরুতর দায়িত্বের কথা জানে না। যাহাতে আমি ইহার উপযুক্ত হইতে পারি, তজ্জন্য প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিব।" কোন সাধারণ বালিকা রাজ্যলাভের কথা শুনিয়া বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া গম্ভীরভাবে এতগুলি কথা বলিতে পারে না।

ভিক্টোরিয়া সপ্তদশবর্ষ বয়সে প্রচলিত রীতি অনুসারে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। যে দিন দীক্ষিত হন, সে দিন তাঁহার মুখে এমনই এক দীন ভাবের বিকাশ হইয়াছিল যে, তাহা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। দীক্ষান্তে পুরোহিত যখন সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করাইয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন, তখন ভিক্টোরিয়া মায়ের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সময়কার ব্যাকুলতা দেখিয়া চতুর্থ উইলিয়ম ও তদীয় পত্নী,মেরী লুইসা এবং উপস্থিত জনবর্গ অশ্রুমোচন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তৎপর

অষ্টাদশবর্ষ বয়সে প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁহার জন্মোৎসব হয় এবং তাহাতে তিনি প্রচুরপরিমাণ উপহার প্রাপ্ত হন। চতুর্থ উইলিয়ম মেরী লুইসার উপর চিরবিরক্ত ছিলেন। তিনি তজ্জন্য ভিক্টোরিয়াকে মাতার তত্ত্বাবধান হইতে অপসৃত করিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে আনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বৃত্তি দানে অগ্রসর হন। রাজকুমারী জ্যেষ্ঠতাতের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বৃত্তিগ্রহণে অসম্মত হন। বার্ষিক লক্ষ টাকার বৃত্তি অগ্রাহ্য করা কতদূর মানসিক বলের আবশ্যক,তাহা সাধারণ নরনারীর চিন্তার অতীত।

কিছুকাল পরেএক দিন গভীর নিশীথে ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদে চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজপুরোহিত, ক্যাণ্টারবারীর ধর্ম্মযাজক, ডাক্তার হার্ডলী ও রাজবাটীর প্রধান কর্ম্মচারী কেনসিংটন প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। অনেক ডাকাডাকির পর তাঁহারা সেই গভীর নিশীথে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইলেন। তখন ভিক্টোরিয়ার চক্ষু ঘুমের ঘোরে ঢুলু ঢুলু করিতেছিল! রাত্রিবাসের উপর একখানি শাল জড়াইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজ-পুরোহিত নতজানু হইয়া তাঁহাকে উইলিয়মের মৃত্যু-সংবাদ দিলেন এবং তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির কথা জানাইলেন। পিতৃব্যের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি নিরতিশয় ব্যথিতা হইয়া বলিলেন—"জেঠা মহাশয়ের মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল,তাহা আমার দ্বারা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। যাহা হউক আপনারা আমার জন্য প্রার্থনা করুন।" তৎপর তাঁহারা ভাবী রাণীর কল্যানার্থে প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাগমন করেন। ভিক্টোরিয়া সেই রাত্রেই আপন জেঠাই মাকে সান্ত্বনা দিয়া যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অতুল

স্নেহ ও গুরুভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তৎপর দিন মন্ত্রীসভা, অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী এবং সাধারণ প্রজাপুঞ্জ ভিক্টোরিয়াকে অভি-নন্দন দিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই বিরাট সভায় তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি সভাস্থলে সকলকে সম্বোধন করিয়া যে কয়েকটী হৃদয়গ্রাহী কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রজারঞ্জন বৃত্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি যখন মাতার সহিত অপেক্ষাকৃত দীনাবস্থায় কেনসিংটনে বাস করিতেন, তখন তাঁহাদের প্রাসাদের পার্শ্বে একটি দরিদ্র সৈনিক পরিবার বাস করিত। তিনি মধ্যে মধ্যে মায়ের সঙ্গে তাহাদিগকে দেখিতে যাইতেন। ভিক্টোরিয়ার এমনি মহত্ত্ব যে, তিনি সিংহাসনারোহণ করিয়াও তাহাদিগের কথা ভুলেন নাই। তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে নানাবিধ সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়া কৃতার্থ করিতেন।

তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়াই ঈশ্বরোপাসন করিতেন। তৎপর কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যখন মায়ের সঙ্গে আহার করিতে বসিতেন, তখন মা ও মেয়ের মধ্যে রাজকীয় কোন বিষয়েই আলোচনা হইত না। তাঁহারা উভয়েই এ বিষয়ে বিশেষ রূপে সতর্ক ছিলেন। যাহারা বলিয়াছিল, ভিক্টোরিয়া মায়ের পরামর্শে সমস্ত কার্য্য করিবেন, তাহারা তাঁহার কার্য্যতৎপরতায় যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও মুগ্ধ হইল। তিনি না বুঝিয়া কোন দলিলে স্বাক্ষর করিতেন না। কোন দলিলে স্বাক্ষর করিতে হইলে, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া প্রধান মন্ত্রীকে বিব্রত করিয়া তুলিতেন। একদা প্রধান মন্ত্রী মেলবোরন্ উপযুক্ত কারণ প্রকাশ না করিয়াই কোন দলিলে স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করেন। ভিক্টোরিয়া অমনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আমি যে বিষয়ে অজ্ঞ, সে বিষয়ে

অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া স্বাক্ষর করিতে পারি না।" এই সকল কারণে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার উপর সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। শাসনভার হস্তে গ্রহণ করিয়া তিনি বিন্দুমাত্রও রুক্ষ হন নাই। বরং তখন তাঁহার অপরিসীম দয়ারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। একদা জনৈক সৈনিক ক্রমান্বয়ে তিনবার কার্য্যক্ষেত্র হইতে পলায়ন করাতে তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। পূর্ব্বে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপত্রে রাজাকে স্বাক্ষর করিতে হইত। তদনুসারে ভিক্টোরিয়ার নিকট ডিউক অব ওয়েলিংটন সেই দণ্ডাজ্ঞা যখন উপস্থিত করিলেন, তখন ভিক্টোরিয়া বলিলেন—"এই ব্যক্তির অনুকূলে কি আর কিছুই বলিবার নাই ?"

ডিউক—"না, এই লোকটা বড় দুষ্ট। সে বার বার তিনবার পলায়ন করিয়াছে।"

রাজ্ঞী—"আর একবার ভাবিয়া দেখুন, ইহাকে ক্ষমা করা যায় কি না ?"

ডিউক—"ইহার চরিত্রের সুখ্যাতি শুনিয়াছি বটে, কিন্তু যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা অমার্জ্জনীয়।"

দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া এই কয়টী কথা শ্রবণ করিয়াই সেই কাগজের উপর স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিলেন—"মার্জ্জনা করা গেল।" তাহার পর যত প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্বাক্ষরার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, ভিক্টোরিয়া তাহার সমস্তই মার্জ্জনা করিয়া আপনার অতুল দয়ার পরিচয় দিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়ার এবম্বিধ ব্যবহারে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় আন্দোলন হয়। তাহার পর হইতেই এই নিয়ম হইল যে, প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় আর মহারাণীকে স্বাক্ষর করিতে হইবে না। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক ব্যাপার

মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। এই উৎসবে নানা স্থানের লোক ইংলণ্ডে সমাগত হইয়াছিল। সেই সময় ভিক্টোরিয়ার জন্য একটী মূল্যবান মুকুট নির্ম্মিত হয়। তজ্জন্য সর্ব্বসমেত ১২৭৬০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কিছুকাল পরে মাতুলপুত্র এলবার্টের সহিত মহা-সমারোহে ভিক্টোরিয়ার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সেই সময় ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে আনন্দধ্বনি উঠিয়াছিল এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত সে উৎসবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত ছিল।

ইংলণ্ডীয় প্রথানুসারে বিবাহের পরে নবদম্পতি একমাসকাল নির্জ্জনবাস করিয়া থাকেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়া এতদূর কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন যে,রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এক দিনের বেশী সে সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। বিবাহের পর মহারাণীর দৈনন্দিন কার্য্য এইরূপে নির্ব্বাহিত হইতঃ—মহারাণী এবং এলবার্ট প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া কিছুকাল অশ্বারোহণে বা শকটে ভ্রমণ করিয়া আসিতেন। তৎপর পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে কতকক্ষণ স্বামী স্ত্রীতে সুকুমার বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। মাধ্যাহ্নিক আহারের পর মহারাণী আবার রাজকার্য্য করিয়া স্বামী বা জননীর সহিত ভ্রমণ করিয়া আসিতেন। রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত স্বামী স্ত্রীতে পড়াশুনা করিয়া শয়ন করিতেন। মহারাণীর চিত্রবিদ্যার আলোচনা সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। একদা তিনি রাজপথে দাঁড়াইয়া একটী চিত্র অঙ্কিত করিতে ছিলেন। কাছে একটী ভৃত্য অপেক্ষা করিতে ছিল। এমন সময় এক জন মেষপালক এক দল মেষ লইয়া আসিতে ছিল; সে পথিমধ্যে জনৈক মহিলাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিল—"আমি মেষ লইয়া যাইব, পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে।" ভৃত্য ধীরে ধীরে বলিল, "নির্ব্বোধ! তুমি কাহাকে কি বলিতেছ? ইনি কে

জান ?" মেষপালক বলিল, "যিনিই হউন, আমার পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে।" ভৃত্য সেই কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ইনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া।" সেই অসম্ভব কথা শুনিয়া মেষপালক একেবারে অচৈতন্য হইয়া রাজপথে পড়িয়া গেল। ভিক্টোরিয়া এত ক্ষণ চিত্র-কার্য্যে এত দূর ব্যাপৃত ছিলেন যে, ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। পরে ভৃত্যের মুখে সমস্ত অবগত হইয়া মেষপালককে সান্ত্বনা দিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

আর একবার মহারাণী স্বামীর সঙ্গে কোন স্থানে পদব্রজে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই সময় বৃষ্টিপাত হওয়ায় দ্রুতবেগে এক বৃদ্ধার কুটীরে উপনীত হন। বৃদ্ধারা সাধারণতঃ গল্পপ্রিয়া। এলবার্ট ও ভিক্টোরিয়াকে পাইয়া সে নানা প্রকার গল্প করিয়া একটী ছাতা দিয়া বলিল—"দেখ বাছা! ছাতাটী যেন হারায় না। কা'ল অবশ্য অবশ্য পাঠাইয়া দিবে।" তাঁহারা বৃদ্ধার সারল্যে মুগ্ধ হইয়া হাসিতে হাসিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। আর একদিন স্বামী স্ত্রীতে শকটারোহণে কোন স্থানে যাইতেছিলেন। সেই সময় অক্সফোর্ড নামক জনৈক যুবক মহারাণীকে লক্ষ্য করিয়া দুই বার পিস্তল ছুড়ে। এলবার্টের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সে বার মহারাণী রক্ষা পান। এই সংবাদে ইংলণ্ডের লোক এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিল যে, ভিক্টোরিয়ার কুশল সমা-চার ঘোষণা করিতে হইয়াছিল। দুর্ব্বৃত্ত অক্সফোর্ড মহারাণীর কৃপায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অষ্ট্রেলিয়াতে নির্ব্বাসিত হয়। সে এখনও বাঁচিয়া আছে। ইহার কিছুকাল পরে মহারাণী একটী পুত্র ও একটী কন্যা প্রসব করেন। পুত্রের নাম এলবার্ট এডোয়ার্ড, কন্যাটীর নাম লুইসা। ইহাদের জাতকর্ম্ম ও নামকরণ উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহার কিয়দ্দিন পরেই

ফ্র্যান্সিস্ নামক অপর এক দুর্ব্বৃত্ত যুবক মহারাণীর প্রাণ সংহারার্থে অক্সফোর্ডের ন্যায় গুলি করে; কিন্তু সন্ধান ব্যর্থ হওয়ায় দুর্ব্বৃত্ত কৃতকার্য্য হয় নাই। ইহারও প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছিল। কিন্তু সেও মহারাণীর কৃপায় এই দণ্ডাজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নির্ব্বাসিত হয়। ইহার কিছুকাল পরে, তিনি ইয়ূরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন।

ভিক্টোরিয়া সামান্য পরিচারকদিগের সঙ্গেও সদ্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন না। এক বার তাঁহার জনৈক সহচারিণীর বিবাহোপলক্ষে তিনি এমন এক খানি সুন্দর চিঠি লিখিয়া ছিলেন যে, তাহাতে তাঁহার সবিশেষ প্রেমের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি তাহাদের সুখে আপনাকে সুখী মনে করিয়া থাকেন। ১৮৫৩ সালে যখন ক্রিমিয়ায় যুদ্ধ হয়, তখন হত ও আহত সৈনিকদিগের জন্য যে প্রকার দুঃখ এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ছিলেন, তাহা অনেকের জননীও করেন কি না সন্দেহ। ৩ রা মার্চ্চ তারিখে যখন আহত সৈনিকেরা দেশে ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি তাহাদিগকে দেখিবার জন্য স্বয়ং চ্যাথাম নগরীতে উপস্থিত হইলেন এবং অতি মিষ্টবাক্যে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। হত সৈনিকদিগের বিধবা পত্নীগণের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য তিনি যাহা করিয়া ছিলেন, পৃথিবীর অতি অল্প রাজা রাণীর সম্বন্ধেই সেরূপ শুনা গিয়াছে।

১৮৫৭ সালে ভারতে সিপাহি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সেই সময় মহারাণী হত ও আহত ইংরেজদিগের সংবাদ পাইবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়া যেমন স্বজাতিবাৎসল্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, ভারতসাম্রাজ্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, সেই সুবিখ্যাত ঘোষণাপত্র দ্বারাও তেমনি অতুল ন্যায়পরায়ণতা এবং প্রজাবাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

১৮৬১ সালে ভিক্টোরিয়া স্নেহময়ী জননী ও প্রাণাধিক স্বামীকে হারাইয়া বড়ই ব্যথিতা হন। তাঁহাদের মৃত্যুতে তিনি এতই কাতর হইয়াছিলেন যে, দীর্ঘকাল কেবল উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেন। ইহার কিছুকাল পরে যখন পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার এক বিশেষ অধিবেশন হয়, তখন ভিক্টোরিয়া অতি মলিন ভাবে সামান্য পরিচ্ছদ পরিয়া সিংহাসনে উপবেশন করেন, এবং রাজমুকুট একপার্শ্বে রাখিয়া মহাসভার কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার সে সময়কার দীনভাব দেখিয়া সকলের চক্ষুই অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি আজ পর্য্যন্ত স্বামীর শোকে অতি দীনভাবে কালাতিপাত করিয়া থাকেন।

ভিক্টোরিয়া আপন সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন। সাধারণ জননীর ন্যায় অতিরিক্ত পরিমাণে আদর দিয়া তিনি সন্তানগণের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেন নাই। যাহাতে তাহারা ধর্ম্মশীল, সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান হয়, তিনি রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তজ্জন্য চিন্তা করিতেন। কেহ যদি কখনও কোন অন্যায় কার্য্য করিত, তিনি তাহাকে উচিত রূপ দণ্ড দিতেন। একবার তাঁহার দুইটী কন্যা চিত্রকার্য্যেনিযুক্তা জনৈক রমণীর বস্ত্রে এবং মুখে রং মাখাইয়া দিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া যখন একথা শুনিতে পাইলেন, তখনই তাঁহার কন্যাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া সেই চিত্রকরীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করাইলেন এবং তাহাদের দ্বারা একটী পোষাক ক্রয় করাইয়া আনাইয়া চিত্রকারীকে দেওয়াইলেন। তাঁহার এই ন্যায়পরায়ণতার জন্যই আজ সমগ্র পৃথিবী মুগ্ধ।

স্বামীহারা হইয়া তিনি যে কি যন্ত্রনা পাইয়াছিলেন, বিপত্নীক ষ্ট্যান্‌লি, যুক্তরাজ্যের সভাপতি স্বর্গীয় জেমস্ এব্রাহাম্ গারফিল্ডের

এবং এব্রাহাম লিঙ্কনের পত্নীদ্বয়কে তিনি যে সান্ত্বনাসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৮৪ সালের এপ্রেল মাসে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাজকুমার লিওপোল্ডের মৃত্যু হয়। তখন আদর্শজননী ভিক্টোরিয়া আপন শোকানল প্রাণের ভিতর চাপিয়া বিধবা পুত্রবধূকে সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন। নিঃস্বার্থ প্রেমের এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত এ জগতে কয়টি পাওয়া যায়? পতির মৃত্যুর পর তিনি সংসারের সমস্ত আমোদ আহ্লাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিলেই হয়। মহারাণীর বৈধব্যাবস্থারও একখানি প্রতিকৃতি দেওয়া হইল।

একবার কোন হাঁসপাতালে একটি পীড়িতা বালিকা বলিয়াছিল, "যদি আমি একবার মহারাণীর দেখা পাই, তবেই আরোগ্য লাভ করিব।" মহারাণী এই কথা শুনিবা মাত্র সেই হাঁসপাতালে গিয়া বালিকাটীকে দেখিয়া আসিলেন। তাঁহার প্রাণ কত কোমল, কত মহৎ, তাহা ইহাতেও বুঝা যায়।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মহারাণীর অৰ্দ্ধশতাব্দীয় রাজ্যোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকে কত দূর ভাল বাসে, এই ঘটনায় তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দয়াময়ী মহারাণী দীর্ঘজীবিনী হইয়া তাঁহার প্রজাপুঞ্জের কল্যাণ করুণ, ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা।

এলিজাবেথ্ ফ্রাই।

কারাবাসিনীদিগের বন্ধু এলিজাবেথ ফ্রাই ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২১ শে জুন তারিখে, ইংলণ্ডের অন্তর্গত নরউইচ্ নগরে, জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জনগার্ণী, তাঁহার মাতা লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ বণিক ডেনিয়েল বেলের কন্যা, কেথারিন বেল। কথিত আছে, সৎস্বভাব, অপরূপ রূপলাবণ্য, সুমধুর কণ্ঠস্বর এবং সদাচরণের বলে এলিজাবেথ বাল্যকালে সকলকে মুগ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এলিজাবেথের চারিটী ভাই এবং সাতটী ভগিনী ছিল। দুঃখের বিষয় বাল্যকালেই এতগুলি ভাই ভগিনী লইয়া তিনি মাতৃহীনা হন। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, মা ভাল হইলে সন্তানও ভাল হইয়া থাকে। কেথারিন বেলের সুশিক্ষায়, তাঁহার সন্তানবৃন্দের স্বভাব অতীব মনোরম হইয়াছিল। শৈশবকালে মাতৃহীন হওয়ায় যদিও সেই ধারাবাহিক শিক্ষার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইয়াছিল, তথাপি এলিজাবেথের খুল্লতাত জোসেফ গার্ণী এবং অন্যান্য পরিজনবর্গের চেষ্টায় সে শিক্ষা একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই।

সতের বৎসর বয়স হইতে এলিজাবেথ দৈনন্দিন লিপি রাখিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে তাঁহার প্রাণের সমস্ত কথা বিবৃত হইত।

এলিজাবেথ্ ফ্রাই।

তাঁহার এই দৈনন্দিন লিপি এমন কৌতুহলজনক ও উপদেশপ্রদ যে, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে আর শেষ না করিয়া থাকা যায় না। গরীব দুঃখীর প্রতি অকৃত্রিম দয়া, ভগবানের প্রতি অটল বিশ্বাস ও ভক্তি, তাঁহার শৈশব জীবনেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। একদা কোন ভজনালয়ে গিয়া, তথাকার গরীব দুঃখীদিগকে নিবিষ্টচিত্তে আচার্য্যের উপদেশ ও পাঠ শ্রবণ করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন —"আমার বড় সাধ হয়, এ দেশের সমস্ত নরনারী এই প্রকার একাগ্রতার সহিত "সুসমাচার" পাঠ ও শ্রবণ করে।"

১৭৯৮ সালের গ্রীষ্মকালে জনগার্ণী, এলিজাবেথ এবং অন্যান্য পুত্রকন্যাসহ নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে বহির্গত হন্। পরিভ্রমণ কালে অনেক পুরাতন আত্মীয় বন্ধুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আত্মীয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ, ও নূতন নূতন স্থান দর্শনজনিত আমোদ আহ্লাদ ব্যতীত, এলিজাবেথ অপর একটী সুখে সুখী এবং আশান্বিত হইয়াছিলেন। তাহা প্রার্থিব কোন সামগ্রী নহে, জনৈক ধর্ম্মাত্মার একটী উপদেশ মাত্র। কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি যদি তোমার জীবনকে ধর্ম্মার্থে উৎসর্গ করিয়া দিতে পার, তবে কালে তুমি অন্ধের আলো, বোবার বাক্য এবং পঙ্গুর চরণস্বরূপ হইয়া পৃথিবীর কাজে লাগিতে পার।" এই উদ্দীপক উপদেশ শুনিয়া এলিজাবেথের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, এবং প্রাণে এক উচ্চ আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইল। তিনি তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে এ সম্বন্ধে এইরূপে আভাস দিয়া গিয়াছেন— "আমি কি আমার ক্ষুদ্র জীবনকে প্রভুর কার্য্যে লাগাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতে পারিব?" শৈশব জীবনেই এলিজাবেথের অন্তরে ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

১৭৯৯ সালে এলিজাবেথ প্রকাশ্যরূপে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে তিনি একটি রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। তাহাতে বহুসংখ্যক বালকবালিকা উৎসুকচিত্তে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিত। বিদ্যালয়টী খুলিবার সময় একটি মাত্র বালক ছিল, পরে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা সত্তর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি যখনই সময় পাইতেন, তখনই ছুটিয়া গিয়া গরীব দুঃখীর অবস্থা পরিদর্শন করিতেন; এবং যাহার যে অভাব দৃষ্টিগোচর হইত, প্রাণ-পণে তাহা পূরণ করিতে যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান, এলিজাবেথের নিত্যব্রত ছিল। পুরাতন ছিন্নবস্ত্র শেলাই কারয়া অসহায় রোগীদিগের জন্য হাঁসপাতালে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিতেন। কোথায়ও ভাল পুষ্প পাইলে যত্ন করিয়া রোগীদিগকে উপহার দিয়া কৃতার্থ হইতেন। সাধারণতঃ ধর্ম্মপরায়ণ নরনারীগণ গম্ভীর হইয়া থাকেন; কিন্তু এলিজাবেথ ইচ্ছা করিয়া কখনও গাম্ভীর্য্যের ভাব ধারণ করিতেন না। যখন হাসিতেন, প্রাণ খুলিয়া হাসিতেন, এবং বিশুদ্ধ সামাজিক আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে লণ্ডননিবাসী জোসেফ ফ্রাই নামক জনৈক ধনী ব্যক্তির সহিত এলিজাবেথের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। "বিবাহিত হইলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারি," এলিজাবেথ এই কথা স্মরণ করিয়া অনেকবার বিবাহ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু জোসেফের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া যখন তাঁহার সমস্ত মতামত অবগত হইলেন, তখন নিশ্চিন্ত মনে বিবাহে সম্মতি দিলেন। ভাবী স্বামীর সহিত এ রূপ ঐকমত্য না হইলে কর্ত্তব্যপরায়ণা এলিজাবেথ কখনও বিবাহ করিতেন কি না

সন্দেহ। বিবাহের পর ফ্রাইদম্পতি লণ্ডনের একটী সুন্দর প্রাসাদে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এলিজাবেথ ক্রমে এগারটী সন্তান প্রসব করেন। তিনি এমনই কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন যে, দাস দাসী বা অপর কোন লোকের হস্তে সন্তানগণের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। চেষ্টা ও যত্নের অভাবে পাছে একটী সন্তানও বিপথগামী হয়, এই ভয়েই তিনি সর্ব্বদা অস্থির থাকিতেন। তিনি প্রতিমুহূর্ত্ত সন্তানগণের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। যখনকার যে কর্ত্তব্য তাহা যথারীতি সম্পন্ন না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। সন্তানগণ যদি কোন বিষয়ে কষ্ট প্রকাশ করিত, তিনি তজ্জন্য যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইতেন। তিনি ভাবিতেন,—"আমি যদি যথোচিতরূপে শিক্ষা দিতে পারিতাম, তবে কি ইহাদের প্রাণে অসন্তোষের ভাব আসিতে পারিত?" হায়! ভারতে যদি এমন দুই চারিটীও মা থাকিতেন, তবে বুঝি এ দেশের এমন দুর্গতি হইত না। তিনি সাধারণ গৃহিণীদিগের ন্যায় দাস দাসীকে কটুকথা বলিতেন না। কেহ যদি কোন অপরাধ করিত, তিনি এমন ভাবে তাহার দোষ দেখাইয়া দিতেন যে, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র ক্লেশ হইত না। বরং তাঁহার উপদেশানুসারে তাহারা আনন্দিত ও উৎসাহিতচিত্তে আপন আপন দোষ সংশোধনে ব্যগ্র হইত। প্রেমময়ী এলিজাবেথের এমনি শক্তি ছিল! ভগবানের সহিত তাঁহার নিত্যযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি প্রার্থনা না করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। প্রার্থনার ভিতর দিয়া তাঁহার জীবনের সমস্ত সমস্যা পূর্ণ হইত। ভীত হইলে বা বিপদে পড়িলে, প্রার্থনার দ্বারা বল লাভ করিতেন। তিনি প্রার্থনাকে তাঁহার আত্মার অন্নজল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বিবাহের পর, আট বৎসরকাল তাঁহার মাথার উপর দিয়া নানাবিধ সাংসারিক বিপদ আপদ চলিয়া গিয়াছিল। তথাপি তিনি ক্ষণেকের জন্যও ভগ্নোদ্যম অথবা ভীত হন নাই। তিনি এই সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিয়াছেন :—"এই আট বৎসরকাল যে নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া অবিচলিত ভাবে অতিক্রম করিয়াছি, তজ্জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ। তিনি কৃপা করিয়া বিপদে ফেলিয়াছিলেন বলিয়াই আমাকে আমি ভাল রূপে চিনিতে পারিয়াছি। নতুবা আমার কি গতি হইত, জানি না। বিপদ যে মানুষের পরম বন্ধু, এ কথা যেন কথনও ভুলিয়া না যাই।"

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শ্বশুর মহাশয় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এলিজাবেথ সেই সময় যে রূপ যত্নের সহিত পিতৃস্থানীয় শ্বশুরের সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কোনও দেশের কোনও পুত্রবধূ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। ইহার কিছুকাল পরই এলিজাবেথের পিতারও মৃত্যু হয়। এককালে পিতা ও শ্বশুরকে হারাইয়া তাঁহার প্রাণ বড়ই উদাস হইয়া পড়ে। পরে মনের শান্তির জন্য পুরাতন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্ল্যাসেটে গিয়া অবস্থান করেন। এইখানে আসার পর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র প্রচুর পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। গরীব দুঃখীর জন্য কিছু করিতে পারেন কি না, এই চিন্তাই তাঁহার প্রাণে সর্ব্বদা জ্বলিত। শ্বশুর ও পিতার শোকে সেই চিন্তাশিখা আরও প্রখর হইয়া উঠিল এবং তিনি নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই একটী বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার সুন্দর শিক্ষাপ্রণালীর কথা শুনিয়া সকলেই আপন আপন কন্যাকে সেই বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন, এবং দিন কয়েকের মধ্যেই ছাত্রীসংখ্যা সত্তর পর্য্যন্ত হইল।

বালিকাদিগকে পুস্তক পাঠ ব্যতীত নানাবিধ কার্য্যকরী বিদ্যাও শিক্ষা দিতেন। এতদ্ভিন্ন গরীব দুঃখীদের শীত ও লজ্জা নিবারণের জন্য একটি পোষাকের কারখানা ও দরিদ্র রোগীদের সাহায্যার্থে ঔষধালয় প্রভৃতি সংস্থাপন করিলেন। এই সকল কারখানার কার্য্যে উপায়-হীন নরনারীদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া দিতেন। যখন শীতের প্রাদুর্ভাব হইত, তখন এলিজাবেথ রাশি রাশি গরম পোষাক লইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যখনি কোন শীতক্লিষ্ট নরনারীর সহিত সাক্ষাৎ হইত, তখনি তাহাকে উপযুক্ত পরিচ্ছদ দান করিতেন। শীতের অধিকাংশ কাল এইরূপ করিতেন। যাহাতে সন্তানগণের উপযুক্ত শিক্ষা হয়, তজ্জন্য ঐ প্রকার বস্ত্রদানের সময় তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন এবং আপন হস্তে বস্ত্র বিতরণ করিতে তাহাদিগকে অনুমতি দিতেন। পরিচ্ছদ বিতরণের সময় ঔষধের বাক্সও সঙ্গে থাকিত। কাহারও কোন পীড়ার কথা শুনিলে, তিনি ছুটিয়া গিয়া উপযুক্ত ঔষধ দান করিয়া যথাসাধ্য সেবা ও শুশ্রূষা করিতেন। তিনি যে গরীব দুঃখীদের কেবল বাহ্যিক অভাব দূরীভূত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন এমন নহে, দুর্নীতিপরায়ণ নরনারীকে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন এবং তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মপুস্তক বিতরণ করিতেন। অসহায় নরনারীর দুঃখে তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদিত! ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে নিউগেটস্থ কারাবাসিনীদিগের দুঃখকাহিনী শুনিয়া তিনি বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার প্রাণ এতদূর ব্যাকুল হইল যে, তৎক্ষণাৎ জনৈক মহিলাকে সঙ্গে করিয়া নিউগেটস্থ কারাগারে না গিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া যে ভীষণ দৃশ্য দেখিলেন, তাহা বর্ণনা করিতেও

লেখনী পরাস্ত হয়। তিনি দেখিলেন, প্রায় তিন শতাধিক নারী একটা ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তিনশতাধিক স্ত্রীলোক একই গৃহে শয়ন, রন্ধন এবং ভোজনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। ধূম ও অগ্নিশিখায় চারিদিক অতি কদাকার হইয়াছে। ইহার মধ্যে শিশু, বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সর্ব্বশ্রেণীর স্ত্রীলোকই আছে। অধিকাংশেরই প্রকৃতি উগ্র, কলহপ্রিয় এবং দুর্দ্দান্ত। কেহ কলহ করিতেছে, কেহ মারামারি করিতেছে, কেহ নানাবিধ অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করিতেছে, কেহ পরস্ব অপহরণের চেষ্টা করিতেছে, কেহ কেহবা আপন আপন অদৃষ্টের কথা স্মরণ করিয়া রোদন করিতেছে। কোথায় বা অজ্ঞান সন্তানগণ দুর্নীতিপরায়ণা জননীর অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতেছে। এই সঙ্কীর্ণ গৃহে, তক্তপোষ বা অন্য কোন প্রকার শয়নের উপকরণ ছিল না। ছিন্ন কন্থা এবং মাদুর পাতিয়াই সেই সেঁতসেঁতে মেঝের উপর সকলে শয়ন করিতেছে; তাহাও সকলের ভাগ্যে জুটিয়া উঠিতেছে না। সকলের পরিধানেই ছিন্ন বস্ত্র। তন্মধ্যে কেহ বা অর্দ্ধনগ্ন। কোন কোন স্ত্রীলোক দর্শকদিগের নিকট সুরা পানের নিমিত্ত পয়সা ভিক্ষা চাহিতেছে। সুবিধা পাইলে অপহরণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে। নিউগেট কারাগারের স্ত্রীবিভাগের এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া দয়াবতী এলিজাবেথের অশ্রুসাগর উথলিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, "ইহাদের জন্য যদি কিছু করিতে না পারি, তবে এ অসার জীবন রাখিয়া ফল কি?" সেই সময়, সেই নরকে দাঁড়াইয়াই, ভগবানের নামে এই দুর্ভাগিনীদের উপকারার্থে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিলেন। এইবারে তিনি যদিচ বিশেষ কোন উপকার করিতে পারিলেন না, তথাপি সঙ্গে করিয়া যে সকল নবপরিচ্ছদ আনিয়াছিলেন, তাহা সেই ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা

নারীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কারাগার হইতে বহির্গত হইলেন।

ইহার পর তিনি একটী সন্তান প্রসব করেন। বারবার সন্তান প্রসব, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং পারিবারিক শোকে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তজ্জন্য প্রায় তিনবর্ষকাল কোন প্রকার জনহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তিন বৎসর পরে, যখন তাঁহার শরীর একটুকু ভাল হইল, তখন আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

ঠিক তিন বৎসর পরে তিনি আবার সেই কারাগারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সমস্ত কারাবাসিনী সমস্বরে আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়াই স্ত্রীবিভাগের দ্বাররুদ্ধ করিয়া সকলকে সস্নেহ বচনে কাছে ডাকিয়া আনিয়া তাহা-দের দুরবস্থা, পাপের পরিণাম, সন্তান সন্ততির ক্লেশ, ধর্ম্ম ও নীতির আবশ্যকতা, পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার, ও শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপরি মহাত্মা ঈশার আত্মত্যাগ ও পাপীর প্রতি প্রেমের কথা বুঝাইয়া দিলেন। সেই পশুপ্রকৃতি-বিশিষ্টা কারাবাসিনীগণ তাঁহার মধুমাখা কথা শুনিয়া গলিয়া গেল। যাহাদের অত্যাচার এবং দুর্ব্ব্যবহারে সমস্ত কারাগার বিকম্পিত হইত, তাহারা আজ এলিজাবেথের সস্নেহ বাক্যে দ্রবীভূত হইল। বহুকাল পরে সেই মরুভূমিতে যেন এক আনন্দের উৎস উৎসারিত হইল। পরে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—"তোমাদিগকে মন্দপথে যাইতে দেখিয়া তোমাদের ছেলে মেয়েরাও অধঃপাতে যাইতেছে। তোমরা যদি এখন হইতে ভাল না হও, তবে তোমাদের সন্তান সন্ততির কি শোচনীয় অবস্থা হইবে, একবার চিন্তা করিয়া দেখ। সেইজন্য

তোমাদের এবং বালক বালিকাদিগের শিক্ষার্থে এই কারাগারের মধ্যেই আমি একটি বিদ্যালয় সংস্থাপনের প্রস্তাব করিতেছি। এই প্রস্তাবে তোমাদের মধ্যে যদি কাহারও সহানুভূতি থাকে, তবে হস্তোত্তলন কর।" বলা বাহুল্য সেই ছয় শত হস্ত একইকালে উত্থিত হইল এবং সকলেরই চক্ষে আনন্দাশ্রু লক্ষিত হইল। পরদিনই পার্শ্বস্থ গৃহে কথিত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল। তাহাতে শিশু হইতে পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া যুবতীদের পর্য্যন্ত পাঠকার্য্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল; এবং সেই কারাবাসিনীদের মধ্য হইতে একটি যুবতীকে শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত করা হইল। এই স্ত্রীলোকটী একটি ঘড়ী চুরী করা অপরাধে শাস্তি পাইয়াছিল। এখন তাহার সদ্ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইল। পোনের মাস পরে ইহার অপরাধ মার্জ্জিত হয়; কিন্তু ক্ষয়কাশে আক্রান্ত হইয়া স্বল্প দিনের মধ্যেই সে ইহলোক পরিত্যাগ করে।

স্কুল সংস্থাপনের পর, ফ্রাই প্রায় সর্ব্বদাই সেই কারাগারে গিয়া নারীদিগের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিতেন। তাঁহাকে দূর হইতে দেখিলেই সকলে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া লাফাইয়া উঠিত, এবং ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিত। তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেই সকলে একখানি টেবিলের চারিপাশে বসিত এবং তিনি সকলের হাতে হাতে এক একখানি বাইবেল দিয়া নিজে একখানি পাঠ করিতেন। যে যে স্থান তাহারা বুঝিতে পারিত না, তিনি অতি সরল ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দিতেন। কোন কোন সময় বাইবেলের গল্পগুলি মুখে বলিতেন, তাহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিত। এতদ্ব্যতীত যাহাতে তাহারা দু পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে, তজ্জন্য সীবনকার্য্য এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যবসায় শিক্ষা দিতেন। কারাগারে অব-

স্থান কালে তাহারা যে সকল পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিত, তিনি তাহা বিক্রয় করিয়া দিতেন। কর্ত্তৃপক্ষগণ যখন দেখিলেন, এলিজাবেথ ফ্রাইয়ের যত্ন ও চেষ্টায় কারাগারে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা যৎপরোনাস্তি সুখী এবং বিস্মিত হইয়া তাঁহার উপদেশানুসারে কারাগার সমূহ সংস্কার করিতে লাগিলেন।

যে সকল কয়েদী মুক্তিলাভ করিয়া চলিয়া যাইত, তাহারা এলিজাবেথকে ভুলিতে পারিত না। তাহারা প্রায় সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ভাষায় তাঁহাকে চিঠি পত্র লিখিত। এলিজাবেথের যত্নে কত মানুষ দেবতা হইয়া গেল, কে তাহার ইয়ত্তা করে? এলিজাবেথ যে কেবল ইংলণ্ডকেই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র করিয়া ছিলেন এমন নহে, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, ডেনমার্ক এবং ইয়ূরোপের অন্যান্য প্রধান প্রধান স্থানের কারাগার এবং হাঁসপাতাল সমূহও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে মহিলারা সভা সমিতি করিয়া তাঁহার কৃত প্রণালী অনুসারে কারাসংস্কার এবং দেশের অন্যান্য অভাব দূরীকরণে যত্নবতী হইয়াছিলেন। ডেনমার্কের রাজা ও রাণী নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সহিত এক টেবিলে আহার করিয়াছিলেন; এবং যে যে উপায় অবলম্বন করিলে কারাসংস্কার হইতে পারে, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই সময় ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর মহিলা এলিজাবেথের সঙ্গে আলাপ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি শুনিতে পাইলেন যে, নির্ব্বাসিত নরনারীগণ জাহাজে করিয়া অপরস্থানে নীত হইবার সময় বড়ই অত্যাচরিত হয়। তিনি এই কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একাকী দীনহীনার ন্যায় সেই কয়েদীদের সঙ্গে জাহাজে করিয়া চলিলেন। তিনি দেখিলেন, জাহাজস্থ পশুদিগকে যে রূপ যত্ন করিয়া

নেওয়া হয়, এই হতভাগা ও হতভাগিনীদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহারও করা হয় না। তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ডেকের উপরিভাগে তাহাদের মধ্যে বসিয়া প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ করিতে লাগিলেন। নির্ব্বাসিত নরনারীগণ তাঁহার এই অকৃত্রিম ধর্ম্মভাব এবং সহানুভূতিতে একবারে গলিয়া গেল। পরে নিউগেটস্থ কারাবাসিনীদের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া তিনি অনেকগুলি বাতুলাশ্রমও পরিদর্শন এবং সংস্কার করিয়াছিলেন।

গরীব দুঃখী বলিয়া তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। এক দিন তিনি যখন গাড়ী করিয়া কোন স্থানে যাইতেছিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, এক জন কাঠুরিয়া তাহার কাঠের বোঝার পার্শ্বে আহত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি এই অবস্থা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। মা যেমন সন্তানকে বুকে করে, তেমনি করিয়া কোলে তুলিয়া যথোচিতরূপে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। পরে যখন সে সুস্থ হইল, তখন তাহাকে স্বয়ং বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

বৃদ্ধ বয়সে তিনি সমুদ্রের ধারে বাস করিতেন। তখন তাঁহার পদব্রজে কোথাও যাতায়াত করিবার শক্তি ছিল না। চক্রবিশিষ্ট চৌকিতে উপবেশন করিয়া গন্তব্য স্থানে যাতায়াত করিতেন। এই অবস্থায়ও তিনি নাবিকদিগকে বাইবেল বিতরণ করিতেন এবং উপদেশ দিতেন। এই প্রকারে খাটিতে খাটিতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর তারিখে গরীব দুঃখীর জননীস্বরূপা শ্রীমতী এলিজাবেথ ফ্রাই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইহলোক পরিত্যাগের পূর্ব্বে কেবল এই বলিয়াছিলেন :—"হে আমার প্রভু! তোমার দাসীকে রক্ষা কর!" যাঁহারা

বলেন ছেলে মেয়ে এবং ঘর সংসার লইয়া সংসারের অন্য কোন কার্য্য করা যায় না, তাঁহারা এই দয়াবতী নারীর কার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইবেন কি ?

কুমারী মেরী কার্পেণ্টার।

ভারত হিতৈষিণী, নারী জাতির পরম বন্ধু, কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের নাম ভারতবাসী ও ইংলণ্ডের দীন দরিদ্রের নিকট চিরস্মরণীয়। তাঁহার পুণ্য-কাহিনী শ্রবণ করিতে কাহার না ইচ্ছার উদ্রেক হয় ? ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল তারিখে, ইংলণ্ডের অন্তর্গত একজিটার নগরে, স্বনামখ্যাত ধার্ম্মিক ও সুবিজ্ঞ ডাক্তার ল্যাণ্ট কার্পেণ্টারের গৃহে মেরী জন্মগ্রহণ করেন। মেরী, কার্পেণ্টার দম্পতির প্রথম সন্তান। ডাক্তার কার্পেণ্টার একজিটারের প্রধান ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তাঁহার সৎস্বভাব, বিনয়, ধৈর্য্য ও জ্ঞানের প্রভাবে তদ্দেশবাসী তাবৎ নরনারী মুগ্ধ ছিল। মেরী ব্যতীত কার্পেণ্টার সাহেবের আরও দুটী পুত্র এবং দুটী কন্যা ছিল। তন্মধ্যে মেরীর বুদ্ধি, বিদ্যা, বিশেষতঃ স্মৃতিশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর ছিল। মেরীর বয়স যখন চারি বৎসর, তখন কার্পেণ্টারগৃহিণী আপন সন্তানগণকে লইয়া একদা নিকটবর্ত্তী ডেভিড্ পাহাড়ে গিয়াছিলেন। তিনি পাহাড়ের শোভায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "আহা! এমন সুন্দর পাহাড় আমরা কখনও দেখি নাই।" সত্যপরায়ণা

কুমারী মেরী কার্পেণ্টার।

অপূর্ব্ব স্মৃতিশক্তিধারিণী মেরী অমনি বলিয়া উঠিলেন—"না মা, আমরা ত এক বৎসর পূর্ব্বে এইস্থানে আসিয়াছিলাম।" মেরীজননী বলিলেন—"না মেরী, তুমি ভুল বলিতেছ!" মেরী গম্ভীর ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ মা, আমরা আসিয়াছিলাম।" তখন তাঁহার স্মরণ হইল, কিছুকাল পূর্ব্বে কোন স্থানে যাইবার সময় এই পাহাড়ে কিয়ৎক্ষণের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। মেরীর বয়স তখন দুই বৎসর চারি মাস মাত্র। মা সন্তানের এই প্রকার স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইয়া গেলেন।

কাজ করিবার প্রবল ইচ্ছা মেরীর শৈশব জীবনেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। একদা ডাক্তার কার্পেণ্টার আপন সন্তানবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া কোন স্থানে যাইতে ছিলেন। পথিমধ্যে একজন কৃষক শস্য ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছিল। তাহাকে কাজ করিতে দেখিয়া বালিকা মেরী বলিয়া উঠিলেন—"আমিও কাজ করিব।" কেহই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে ডাক্তার কার্পেণ্টার তাঁহার হাতে একটী ছোট লাঠি দিলেন। মেরী সেই লাঠি দিয়া কতক্ষণ শস্যের শিশ্ সংগ্রহ করিয়া পরে তাঁহাদের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। পরে যে ফুলের সৌরভে চারিদিক মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহার পরিচয় মুকুলেই পাওয়া গিয়াছিল।

কর্ত্তব্যপরায়ণ সুবিজ্ঞ ডাক্তার কার্পেণ্টারের যত্নে কুমারী কার্পেণ্টার অতি অল্পদিনের মধ্যেই লাটিন, গ্রীক, সুকঠিন গণিত শাস্ত্র এবং সাহিত্য আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। এতদ্ভিন্ন গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্মেও তিনি সবিশেষ পারদর্শিনী হইয়া উঠিলেন।

১৮১৭ সালে ডাক্তার কার্পেণ্টার একজিটার পরিত্যাগ করিয়া ব্রিষ্টল নগরে আসেন। এই খানে আসার পর তাঁহার কার্য্য অধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত হয়। প্রাত্যাহিক দিবা-বিদ্যালয় ভিন্ন একটী রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়ও সংস্থাপন করেন। কিছুকাল পর ডাক্তার কার্পেণ্টার যখন কার্য্যভারে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন প্রাত্যাহিক বিদ্যালয়টী বাধ্য হইয়া তুলিয়া দিলেন। বিদ্যালয় উঠিয়া যাওয়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার জন্য মেরীর প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়; তদনুসারে উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিবার জন্য তিনি ভগ্নী এনাকে লইয়া কিছু দিবসের জন্য ফরাসী দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। ব্রিষ্টলে প্রত্যাগত হইয়া মা ও ভগ্নীগণের সাহায্যে একটী

বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন এবং প্রভূত যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে নীতি-বিদ্যালয়ের কার্য্য করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই উভয় বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল।

আমাদের দেশের দরিদ্রদিগের অবস্থা হইতে ইংলণ্ডের দরিদ্র-দিগের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। তদ্দেশীয় যে সকল দরিদ্র তত উপার্জ্জনক্ষম নহে, তাহারা আপন আপন সন্তানগণকে খাইতে দিতে না পারিয়া অনেক সময় রাস্তা ঘাটে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। অপর দিকে এই সকল দরিদ্র ব্যক্তি এমনই অশি-ক্ষিত ও অসভ্য যে, অনেক সময় ইহারা পরস্পরের প্রতি পশুবৎ ব্যবহার করে। ইহাদের অবস্থা দেখিলে হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রেই না কাঁদিয়া থাকিতে পারেন না। দয়াময়ী দীনজননী কুমারী কার্পে-ণ্টারের প্রাণ ইহাদের দুঃখে গলিয়া গেল। ইহাদের জ্ঞান ও নীতি শিক্ষার জন্য তিনি ১৮৩১ সালে একটী বিদ্যালয় সংস্থা-পন করিলেন। উল্লিখিত বালিকা-বিদ্যালয় এবং শেষোক্ত অনাথ-বিদ্যালয়ে তিনি যে কেবল স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন এমন নহে, সুকঠিন গ্রীক ও লাঠিন ভাষা এবং তৎসঙ্গে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রভৃতিও সাধ্যানুসারে শিক্ষা দিতেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে দুই জন খ্যাতনামা অতিথি কার্পেণ্টার-গৃহে সমাগত হন। এক জন ভারতগৌরব মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, অপর ব্যক্তি ইয়ুনাইটেড্‌ষ্টেট্‌ নিবাসী ডাক্তার টুকারম্যান। রামমোহন রায় ডাক্তার কার্পেণ্টারের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার জন্য ব্রিষ্টল নগরে উপনীত হন এবং তাঁহার গৃহে কয়েক দিন অবস্থিতির পর রোগা-ক্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার ত্যাগ স্বীকার, দয়া, দাক্ষিণ্য ও উদার ধর্ম্ম-মতের কথা শুনিয়া মেরী একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, এবং

তজ্জন্য তিনি সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে অতীব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। রামমোহন রায় যত দিন পীড়িত ছিলেন, কার্পেণ্টার আপন আত্মীয়ের ন্যায় তাঁহার সেবা এবং কুশল কামনা করিতেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর কি ভীষণ দিন! সে দিন যখন রামমোহন রায়ের প্রাণবিয়োগ হইল, তখন ভারতের সর্ব্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে মেরীর হৃদয়ও ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি একটী কবিতায় তাঁহার সেই মর্ম্মযাতনা কতক পরিমাণে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

তোমার অমর আত্মা—তোমার অমর নাম,—
তোমাতে স্বদেশী তব হ'বে ধন্য অবিরাম ;
সমাধি হইতে তব সবলে উঠিয়া কথা,
পরশি তা'দের প্রাণ লইবে ত্রিদিব যথা ! *

পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া যুবতীর প্রাণে যে কি গভীর সাধুভক্তি ছিল, তাহা এই একটী কবিতা পাঠ করিলেই বুঝা যায়।

মহাত্মা ডাক্তার জোসেফ্ টুকারম্যানও অতি পরোপকারী ও সদাশয় লোক ছিলেন। ডাক্তার কার্পেণ্টারকে ব্রিষ্টলনিবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যেমন দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, টুকারম্যানও আমেরিকাবাসীর নিকট তেমনি শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিতেন। টুকারম্যান পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। কাহারও দুঃখের কথা শুনিলে তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল বারিধারা বিনির্গত হইত। কুমারী

*"Thy Spirit is immortal, and thy name
Shall by thy countrymen be ever blest,
E'en from the tomb thy words with Power shall rise,
Shall touch their hearts, and bear them to the Skies."

কার্পেণ্টার এই মহৎ ব্যক্তিরও পূজা করিতে ভুলেন নাই। রাজা রামমোহন এবং টুকারম্যানের জীবনের প্রতিবিম্ব মেরীর হৃদয়ে অতি উজ্জ্বলরূপে পতিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের প্রদীপ্ত সেই উৎসাহাগ্নি তথায় আমরণ প্রজ্জ্বলিত ছিল।

এই সময় মেরী প্রাত্যহিক এবং রবিবাসরীয় কর্ম্ম ব্যতিরেকে দরিদ্র-দিগের সাহায্যার্থে একটী সমিতি স্থাপন করেন। এই সভাতে অনেক-গুলি মহিলা ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে দরিদ্র-পল্লীর এক একটী বিভাগের ভার ন্যস্ত ছিল। প্রত্যেককে স্ব স্ব বিভাগ রীতি-মত পরিদর্শন করিতে হইত। দরিদ্রদিগের মধ্যে যাহারা সাহায্যের উপযুক্ত, এই সভা হইতে তাহাদিগকে যথোচিতরূপে সাহায্য করা হইত। এই সভার কার্য্য তিনি অতীব যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন।

১৮৩৯ সালে, অতিরিক্ত পরিশ্রম বশতঃ ডাক্তার কার্পেণ্টার অতিশয় পীড়িত হন। তজ্জন্য ডাক্তারগণ দেশ পরিভ্রমণের ব্যবস্থা দেন। ১৮৪০ সালে মহামতি ডাক্তার ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার যখন ইটালি অভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন সমুদ্রে নিমগ্ন ও অদৃশ্য হন। ইতি-পূর্ব্বে রামমোহন রায় ও অপরাপর বন্ধুর মৃত্যুতে মেরীর প্রাণ শোকা-কুল ছিল, এখন পিতার মৃত্যুতে তাঁহার কোমল প্রাণ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু তিনি কি এই শোকের আবেগে সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহার জীবনের হা'ল ছাড়িয়া দিলেন? মেরী তেমন মেয়ে ছিলেন না। তাঁহার প্রাণে যে ঐশীশক্তি ছিল, সেই ঐশী-শক্তির প্রভাবেই তিনি আবার কার্য্যস্রোতে আপন জীবনতরণী ভাসাইয়া দিলেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ধ্যান ও প্রার্থনা' নামে এক খানি গ্রন্থ প্রচার

করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার প্রাণের গভীর ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সাধারণ্যে এই গ্রন্থের এত আদর হইয়াছিল যে, অল্প দিনের মধ্যেই তাহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়।

এই সময় চর্ম্মকার পঙ্গু মহামতি জন্ পাউণ্ডস্ দরিদ্রদিগের শিক্ষাসম্বন্ধে সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। দরিদ্র বালক বালিকাদের জন্য পূর্ব্ব হইতেই মেরী চিন্তিতা ছিলেন। জন পাউণ্ডসের মৃত্যুতে তাঁহার প্রাণে এক নূতন ভাবের সূত্রপাত হইল। অতুল অধ্যবসায় এবং যত্নসহকারে তিনি ব্রিষ্টল নগরে দরিদ্র বালক বালিকাদের জন্য একটী বিদ্যালয় (Ragged school) সংস্থাপন করিলেন। যে অবসরটুকু ছিল, মেরী তাহাও এই স্কুলের জন্য ব্যয় করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলটী উন্নতি লাভ করিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে এই স্কুল সংস্থাপিত হয়। সেই দিনই ভয়ঙ্করী দাসত্ব প্রথা উঠিয়া গিয়া সুসভ্য ইংলণ্ডের কলঙ্কমোচন হয়।

মেরী কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই দেখিলেন যে, কারাগারবাসী বালক বালিকা অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবকদিগের শিক্ষার কোন প্রকার সুবন্দোবস্ত নাই। বরং কুসংসর্গে বাস করিয়া তাহারা যৎ-পরোনাস্তি কুশিক্ষা লাভ করিতেছে এবং চারিদিকের নৈতিক বায়ুকে দূষিত করিয়া ফেলিতেছে। তাঁহার প্রাণে একবার যাহা জাগিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত না করিয়া ছাড়িতেন না। কারা-গার সংস্কারসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য, তিনি ১৮৫১ সালে "অপরাধী বালক বালিকাদের জন্য সংশোধন বিদ্যালয়" * নামে

* "Reformatory Schools for the Children of the Perishing classes and for Juvenile offenders."

একখণ্ড পুস্তিকা প্রচার করেন। তিনি প্রথমতঃ অভীষ্ট বিষয়ে অকৃত-কার্য্য হইয়া পরে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, সুপ্রসিদ্ধ কবি লর্ড বায়রণের পত্নী শ্রীমতী লেডি নোয়েন বায়রণ, অপরাধী বালিকাদের শিক্ষার্থে একটী সংশোধন বিদ্যালয় স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে, ব্রিষ্টল নগরে একটী সুন্দর বাটী ক্রয় করিয়া দেন। এই বাটীতে প্রথমতঃ দশটী বালিকা লইয়া মেরী কার্পেণ্টার কার্য্যারম্ভ করেন; কিন্তু ১৮৫৬ সালে ছাত্রী সংখ্যা বায়ান্ন পর্য্যন্ত হইয়াছিল। মেরীর কর্ত্তৃত্বে এই বিদ্যালয় হইতে শত শত বালিকা,—যাহারা চৌর্য্য অপরাধে কলঙ্কিত হইয়াছিল,—বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম্মে অলঙ্কৃতা হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই মহৎ কার্য্যের মূলে কুমারী কার্পেণ্টারের কতখানি প্রেম ছিল, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

মেরী পঞ্চাশৎতম বর্ষে পদার্পণ করিয়াই মাতৃহারা হন। সংসারের সহিত তাঁহার যে এক মাত্র বন্ধন ছিল, তাহাও ছিন্ন হইল। এখন সমগ্র প্রাণটী জগতের সেবায় নিযুক্ত হইল।

১৮৬১ সালে মেরী আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত কারাগার সমূহ পরিদর্শন করেন; এবং তাহাতে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহা অতি সরল, প্রাঞ্জল এবং ওজস্বিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন। অপরাধী বালক বালিকাদিগকে সংশোধন করিবার জন্য তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, বয়স্ক অপরাধী সম্বন্ধেও সেই উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এবারে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ইহার কিছুকাল পরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়দ্বয় অধ্যয়নার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায়

কুমারী কার্পেণ্টারের সহিত তাঁহাদের আলাপ হয়। ইঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি ভারতবর্ষে আসিবার জন্য ব্যাকুল হন। এই সময় তাঁহার বয়স ষাট বৎসর। এই বয়সে বাঙ্গালী অকর্ম্মণ্য হয়, অপরাপর জাতীও বিশ্রাম অন্বেষণ করে। কিন্তু মেরী কার্য্য করিবার জন্যই যেন বিশেষরূপে প্রেরিত হইয়া ছিলেন। তাই এই বৃদ্ধাবস্থায় সুবিশাল সমুদ্র পার হইয়া সুদূর ভারতবর্ষে আসিতে প্রস্তুত হইলেন। ইংলণ্ড ছাড়িবার পূর্ব্বে, "ইংলণ্ডে রাজা রামমোহনের শেষ কাল [Last days in England of Raja Rammohan Ray] নামক একখানি গ্রন্থ ভারতবাসীদের জন্যই বিশেষ ভাবে প্রকাশ করেন। ১৮৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের সহিত তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন।

প্রথমতঃ তিনি বোম্বায়ে পদার্পণ করেন। সেখান হইতে আহাম্মদাবাদে জজ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া সেখানকার বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। আহাম্মদাবাদ হইতে সুরাটে যান। এই স্থানে জনৈক দেশীয় মহিলা তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র দেন। সেই পত্রের শীর্ষদেশে "প্রিয়মাতঃ" বলিয়া সম্বোধন ছিল। অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া কুমারী কার্পেণ্টার বড়ই সুখী হইয়াছিলেন। সুরাট হইতে আবার বোম্বায়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অনেকগুলি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। সেখান হইতে পুনা এবং পুনা হইতে মান্দ্রাজে উপনীত হন, এবং তথায় অনেকগুলি বন্ধু লাভ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করেন। কলিকাতায় তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল সার জন লোরের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে বাস করেন। এখানে আসিয়া শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী,

পাদ্রী লং এবং অপরাপর বন্ধুবর্গের সহিত অনেকগুলি দেশীয় বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। একদিন উড্রো. এট্‌কিনসন্‌ ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে উত্তরপাড়া স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ী হইতে পড়িয়া যান। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ধীরাজ যে গানটী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত হইল ;—

অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে,
করে তুল্‌ছে তোলা পাড়ী, এবার নাইকো ছাড়াছাড়ি,
মিস্‌ কার্পেণ্টার সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে।
কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই সবই দেখেছে,
এখন এসে কল্‌কাতাতে (এবার) বাঙ্গালীদের নে পড়েছে।
উত্তরপাড়া স্কুলে যেতে, বড়ই রগড় হলো পথে,
এট্‌কিন্সন উড্রো আর সাগর সঙ্গেতে।
নাড়া চাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে
গাড়ী উল্টে পল্লেন সাগর, অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে ॥

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বোম্বাই টাউনহলে তাঁহাকে এক অভিনন্দন দেওয়া হয়। তার পর ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তৎ পর বৎসর আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি "কারা-শাসন-প্রণালী" এবং "ভারতীয় স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য" নামে দুইখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। পরবৎসরে "ভারতে-ছয়-মাস" নামে আরও একখানি পুস্তক প্রচার করেন। এই বই খানি রাজা রামমোহনের স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশে উৎসর্গ করেন।

১৮৬৮ সালে তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় বোম্বাই স্ত্রী-নর্ম্মাল-বিদ্যা-

লয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ১২০০০ সহস্র টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন এবং গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুরোধে তিনিই ঐ স্কুলের তত্ত্বাবধায়িকা পদে নিযুক্ত হন্। কিন্তু পরবর্ত্তী বর্ষের প্রারম্ভেই শারীরিক অসুস্থতা এবং অন্যান্য কারণে তিনি ইংলণ্ডে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। কিন্তু ইংলণ্ডে গিয়াই কি তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন? তাঁহার প্রাণ ভারতের দুরবস্থায় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তিনি কোন্ প্রাণে স্থির থাকিবেন? কিছুকাল পরে, তিনি আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। এবার তিনি এই চারিটী বিষয়ে বিশেষ ভাবে হস্তক্ষেপ করেন—(১) স্ত্রী-শিক্ষা (২) কারা সংস্কার (৩) সংশোধন এবং শ্রমজীবী বিদ্যালয় (৪) স্ত্রী-কর্ম্মচারী নিয়োগ। এইবারকার কার্য্যের ফল তিনি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায়ও অবগত করাইয়াছিলেন। তৎপর আবার দেশে ফিরিয়া যান। ১৮৭৭ সালের ৩রা এপ্রেল তারিখে তিনি সত্তর বর্ষ বয়সে পদার্পণ করেন। বিজয়ী সেনার ন্যায় অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতে করিতে ১৪ জুন তারিখে একটী পালিতা কন্যা রাখিয়া মেরী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দেহ আর্ণসভেইলে প্রোথিত হয়। মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বন্ধুবর্গ, সংশোধন-বিদ্যালয়, শ্রমজীবি-বিদ্যালয়, এবং দিবা-বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গ শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়া সমাধি স্থানে গমন করেন। ১৪ই জুন তারিখে ব্রিষ্টলের দরিদ্র ও অনাথ ছাত্রবর্গের যেমন সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতেরও তেমনি মহা অনিষ্ট হইয়াছে।
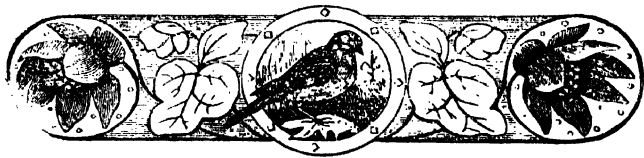
পণ্ডিতা রমা বাই সরস্বতী।

প্রতিভার জীবন্ত মূর্ত্তি, জন্ম দুঃখিনী হিন্দুবাল-বিধবার পরম হিতৈষিণী, সুবিখ্যাতা পণ্ডিতা রমা বাই সরস্বতীর নাম কে না শুনিয়াছে? ইঁহার জ্ঞানপিপাসা, দয়া ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগ দেখিয়া, ভারতবর্ষ ত দূরের কথা, সুদূরবর্ত্তী ইয়ুরোপ ও আমেরিকানিবাসিগণও স্তম্ভিত হইয়াছেন। এমন পুণ্যশীলা, দয়াবতী নারীর কীর্ত্তি-কাহিনী শুনিতে কাহার প্রাণ না ব্যাকুল হয়?

বহুদিন অতীত হইল ব্রাহ্মণবংশীয় এক জন মহারাষ্ট্রী পণ্ডিত একদা তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং নবম ও সপ্তম বর্ষ বয়স্কা দুটী কন্যাসহ তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা গোদাবরীর তীরস্থিত কোন নগরে উপনীত হন এবং তথায় দুই তিন দিন বাস করেন। এক দিন পণ্ডিত মহাশয় গোদাবরী হইতে স্নান তর্পণ করিয়া যেমন উঠিবেন, অমনি সম্মুখে একটী সুন্দর যুবা পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। যুবকের সুন্দর মুখশ্রী,

পণ্ডিতা রমা বাই সরস্বতী।

সপ্রেম করুণ দৃষ্টি, সুস্থ সবল ও সুদৃঢ় অবয়ব দেখিয়া হঠাৎ যেন তাঁহার প্রাণে কেমন এক অভিনব ভাবের উদ্রেক হইল। তিনি বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত না হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

যখন শুনিলেন, যুবক বিপত্নীক এবং ব্রাহ্মণকুমার, তখন তাঁহার সহিত আপন জ্যেষ্ঠ দুহিতার পরিণয় প্রস্তাব না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। যুবকও প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। সেই বাপীতটেই যাবতীয় কথা বার্ত্তা স্থিরীকৃত হইয়া পরদিন শুভলগ্নে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহান্তে যুবক আপন পত্নীসহ স্বদেশে চলিয়া গেলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাও দুহিতাকে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া আনন্দ মনে আপন অভীষ্ট সাধনে অগ্রসর হইলেন।

এই নবোদ্বাহিত যুবকের নাম অনন্তশাস্ত্রী এবং বালিকার নাম লক্ষ্মী বাই। মেঙ্গালোর জিলায় অনন্তের নিবাস। এই ব্রাহ্মণ-দম্পতিই পণ্ডিতা রমা বাইয়ের জনক জননী। অনন্ত শাস্ত্রীর প্রথম বিবাহক্রিয়া অতি শৈশবেই সম্পন্ন হয়। বিবাহের পরই, তাঁহার জ্ঞান পিপাসা প্রবল হইয়া উঠে। তিনি পুণা নগরে প্রবীণ অধ্যাপক রামচন্দ্র শাস্ত্রীর নাম এবং তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী ও অপরিসীম ছাত্র-বাৎসল্যের কথা শ্রবণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবিলম্বে তথায় গিয়া রামচন্দ্র শাস্ত্রীর ছাত্রত্ব স্বীকার করিলেন। রামচন্দ্র পেশোয়া প্রাসাদের রাণীকে সময় সময় সংস্কৃত শিক্ষা দিতে যাইতেন। সেই সময় অনন্তও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। একদা এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে উল্লিখিত রাণীকে একখানি সংস্কৃত কবিতাগ্রন্থ পাঠ করিতে দেখিয়া অনন্তের প্রাণ সাতিশয় বিস্মিত এবং আনন্দিত হইল। তাঁহার মনে হইল,—আহা! অজ্ঞান কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারী-জাতি যদি এই প্রকার জ্ঞানানুশীলন করে, তবে তাহাদের পরিবার, গৃহ ও দেশ কত সুখের হয়"। জ্ঞানপিপাসু অনন্ত স্থির করিলেন, যে কোন প্রকারেই হউক, বালিকা (প্রথমা) পত্নীকে শিক্ষাদান

করিতেই হইবে ; অনন্ত ত্রয়োবিংশতি বর্ষ বয়সে শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপন পত্নীর শিক্ষার্থে যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই নির্ব্বোধ বালিকা গুরুজনবর্গের প্ররোচনায় এবং অপরাপর স্ত্রীলোকদিগের পরামর্শে কিছুতেই স্বামীর অনুরোধ রক্ষা করিল না। অনন্তের সকল আশা ব্যর্থ হইয়া গেল। কিছুকাল পরে এই বালিকা দুই একটী সন্তান প্রসব করিয়াই অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইল।

দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়া অনন্ত তাঁহার পূর্ব্ব আশা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বাড়ীতে পহুঁছিয়াই লক্ষ্মী বাইয়ের শিক্ষাকার্য্যে মনযোগী হইলেন। পরিবারের লোকেরা পূর্ব্ববৎ কত আপত্তি উত্থাপন করিলেন, স্থির-প্রতিজ্ঞ অনন্ত কাহারও কথা গ্রাহ্য না করিয়া আপন মনে তাহাকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু গৃহে থাকিলে যথোচিতরূপে শিক্ষা দিতে পারিবেন না ভাবিয়া, একদিন বালিকা-পত্নীকে লইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী গঙ্গামল নামক এক ঘোর অরণ্যে তাহাকে লইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কি অপরিসীম জ্ঞান পিপাসা! যে দিন বুঝিলেন নারী জাতির জ্ঞানশিক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, সেই দিন হইতেই অনন্তের প্রাণ তাঁহাদের জন্য কাঁদিয়া উঠিল, এবং প্রথমেই স্বগৃহে দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া, বনে বনে ঘুরিয়া আপন পত্নীর শিক্ষা বিধান করিতে লাগিলেন। ইহা কি সামান্য প্রশংসার কার্য্য ? যে জাতি এক দিন দুর্দ্দান্ত আওরেংজেব পাত্শাকেও চমক লাগাইয়াছিল, সেই মহারাট্টা জাতীয় অনন্তের এমন অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উদ্যম থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এক দিন

এই বিজন অরণ্য হইতে অনন্ত বাহির হইতে পারিলেন না। সস্ত্রীক সেই খানেই সমস্ত রাত্রি কাটাইতে বাধ্য হন। যখন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন প্রকাণ্ড একটা ব্যাঘ্র তাঁহাদের নিকটে আসিয়া ভয়ানকরূপে গর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তের পত্নী ভয়ে জড়সড় হইয়া লেপমুড়ি দিয়া মাটীর সঙ্গে যেন একেবারে মিশিয়া রহিলেন। ভোর না হওয়া পর্য্যন্ত অনন্ত সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পত্নীকে ব্যাঘ্রমুখ হইতে রক্ষা করিলেন। অরণ্যের মধ্যে এই প্রকার বিপদ কতদিন যে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। এই প্রকার বিপদ আপদ মাথায় লইয়াই নির্ভীক অনন্ত শাস্ত্রী আপন পত্নীর শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই লক্ষ্মীবাই নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন।

কিছুকাল পরে অনন্ত একটী নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই নব গৃহে আগমনের পর লক্ষ্মী বাই একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা প্রসব করিলেন। কনিষ্ঠা কন্যা ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই আমাদের রমা বাই। শাস্ত্রীদম্পতি প্রাণপণে আপন সন্তানদিগকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। রমার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া, লক্ষ্মী বাই অতি যত্নের সহিত প্রিয়তমা দুহিতার শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। অতি অল্প বয়সেই প্রথমা কন্যার বিবাহ হয়। ঋণের জন্য অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া যাওয়ায়, অনন্ত মহা বিপদগ্রস্ত হইলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া পুত্র কলত্র লইয়া যথা তথা পরিব্রাজকের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যখন ইহারা গৃহ হইতে বহির্গত হন, তখন রমার বয়স নয় বৎসর মাত্র। এই দুরবস্থার দিনেও পরিব্রাজক অনন্ত শাস্ত্রী রীতিমত আপন

পুত্র কন্যার, বিশেষতঃ রমা বাইয়ের শিক্ষার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যাটীকে অসময়ে বিবাহ দেওয়াতে কি অনিষ্ট হইয়াছিল, তাহা অনন্ত বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রমার বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ষোল বৎসর পূর্ণ হইবার দেড় মাস পরেই রমা বাই পিতৃ-মাতৃ-হীন হন্। দীন দরিদ্র অনন্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধনোপযোগী এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। জননীর শব সার্দ্ধক্রোশ পরিমাণ দূরস্থিত শ্মশান ঘাটে বহন করিয়া লইবার জন্য প্রথমে কাহারও সাহায্য না পাইয়া রমা বাই এবং তদীয় সহোদর বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে দুইজন সদাশয় ব্রাহ্মণের সাহায্যে কোন রূপে তাঁহার সৎকার-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। দুর্ভাগিনী রমাকেও আপন জননীর শব বহন করিতে হইয়াছিল। সংসারের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট শৈশব হইতেই রমার জীবনে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। জনক জননী এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মৃত্যুর পর রমা বাই সহোদরের সঙ্গে তীর্থে তীর্থে, নগরে নগরে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। অনন্ত শাস্ত্রীর কষ্ট ও পরিশ্রম বৃথা যায় নাই। যে স্ত্রী-শিক্ষা-প্রচারকে তিনি জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, রমা বাই এবং তদীয় ভ্রাতাও সেই মহান্ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া দেশে দেশে তাহা প্রচার করিতে লাগিলেন। নারী জাতির সংস্কৃত এবং স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষা করা যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাই ভাই ভগিনী নানা স্থানে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময় ইঁহাদের পরিধানে ভাল বস্ত্র ছিলনা, ভাল রূপ আহার জুটিত না, তথাপি ক্ষণ কালের জন্য লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন্ নাই। জাতি এবং বংশগত অধ্যবসায় ইঁহাদের প্রাণে পূর্ণ মাত্রায় ছিল।

পর্য্যটন করিতে করিতে, কিছু কাল পরে, ইঁহারা কলিকাতা নগরে উপনীত হন্, এবং এখানেও অন্যান্য স্থানের ন্যায় "স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। স্ত্রীলোকের মুখে প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা শুনিয়া পণ্ডিত মণ্ডলী যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া রমা বাইকে নানা বিষয় পরীক্ষা করিলেন এবং আশাতীতরূপে সন্তোষ লাভ করিয়া 'সরস্বতী' উপাধি প্রদান করিলেন। তৎপর ইঁহারা ঢাকা নগরীতে উপস্থিত হন। তথায় রমার একমাত্র সহোদর অসহায়া রমাকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি রুগ্ন শয্যায় শায়িত হইয়া সর্ব্বদাই রমা বাইয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হইতেন এবং চোখের জলে বুক ভাসাইতেন। দাদার এই ব্যাকুলতা দেখিয়া রমা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতেন,—"আপনার চিন্তা কি? ভগবান যাহাদের সহায়, তাহাদের কি ভয়? তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন। আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।" রমার মুখে এবম্বিধ আশ্বাস বাক্য শুনিয়া ভাইয়ের মুখে আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিত এবং তিনি গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিতেন—"তুমি ঠিক বলিয়াছ, যখন পরমেশ্বর আমাদের সহায়, তখন আর ভয় কি?" পরমেশ্বরের ইচ্ছা কে বুঝিবে? অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রাণ-পাখী জনক জননীর অনুগমন করিল।

কিছু কাল পরে সহায়হীনা রমা বাই শ্রীহট্ট নগরীতে উপনীত হন্। তথায় এক বিরাট সভায় তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। শ্রীহট্ট মিশন স্কুলের সংস্থাপক মহাত্মা রেভারেণ্ড প্রাইজ্ সেই অভিনন্দন পত্র খানি পাঠ করিয়া ছিলেন। এই সময়েই শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাতু গ্রাম নিবাসী বাবু বিপিন বিহারী দাস এম, এ, বি, এল মহাশয়ের

সহিত তাঁহার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিপিন বাবু অথবা রমা বাই প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মে বিন্দু মাত্রও বিশ্বাস করিতেন না। তদ্ধেতুই রমা বাই ব্রাহ্মণ কুমারী হইয়াও সাধু জাতীয় যুবকের সহিত পরিণীতা হওয়া অন্যায় বোধ করেন নাই। এই বিবাহ ১৮৭২ সালের তিন আইনানুসারে রেজেষ্টরী হইয়াছিল। বিবাহের পর বিপিন বাবু রমা বাইকে লইয়া কাছাড়ে যান। সেইখানে তিনি ওকালতী করিতেন। দুঃখের বিষয়, অল্পদিনের মধ্যেই রমার এই সুখ অন্তর্হিত হইল। বিপিন বাবু অতি অল্প বয়সে, বিবাহের কিছু দিন পরেই বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি নানা শাস্ত্রে, বিশেষতঃ রসায়ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি "রসায়নের উপক্রমণিকা" নামে যে একখানি বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের এক উপাদেয় সামগ্রী। বিবাহের পর বিপিন বাবু উনিশ মাস মাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে রমা বাই একটী কন্যা প্রসব করেন। তাঁহারা উভয়ে আদর করিয়া তাহার নাম মনোরমা রাখিয়াছিলেন। এখন এই মনোরমাই রমার একমাত্র ধন।

যে দৃশ্য দেখিলে চোখ ফাটিয়া জল আসে, রমা সেই বিধবাবেশে এক মাত্র নয়নের তারা, অঞ্চলের নিধি কন্যাটীকে বুকে লইয়া পূর্ব্ববৎ স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে বহির্গত হইলেন। প্রচার করিতে করিতে আবার আপনার দেশ মহারাষ্ট্রে আসিয়া উপনীত হইলেন। পুনা-নগরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য "আর্য্যমহিলা-সমাজ" নামে এক সভা এবং স্থানে স্থানে তাহার শাখা সভা স্থাপন করিলেন। রমা যখন বুঝিলেন, সংসারের সুখ তাঁহার জন্য নহে, তখন তিনি প্রাণমন ঢালিয়া সমদুঃখিনীদের জন্য খাটিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা, যত্ন এবং অধ্যবসায়ের ফলে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির

তাবৎ লোক স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করিল এবং স্থানে স্থানে সভা সংস্থাপিত হইল। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধিমতী রমা দেখিলেন, তিনি এই মহৎ কার্য্যের তখনও সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাঁহার আরও জ্ঞান লাভ করা, বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করা, আবশ্যক। তদ্ধেতু তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন।

ইংলণ্ডে পহুঁছিবামাত্র ওয়াণ্টেজ্ (Wantage) নগরীতে "সেণ্টমেরী হোমের" (St. mary's Home) ভগিনীগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই খানে তিনি এবং মনোরমা ১৮৮৩ সালে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন্। দীক্ষার পর এক বৎসর কাল ওয়াণ্টেজ্ নগরীতে কেবল ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করেন। ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত হইলে, ১৮৮৪ সালে চেল্টেনহাম (Cheltenham) নগরে মহিলা বিদ্যালয়স্থ সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপিকা হইলেন এবং অবসর সময়ে সেই বিদ্যালয়েই গণিত, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিতেন। কিছু কালের মধ্যেই তিনি নানা শাস্ত্রে পারদর্শিনী হইয়া উঠিলেন। তৎপরে কোন অধ্যাপিকার পদ লাভ করিয়া ১৮৮৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকা দেশে উপস্থিত হইলেন। তথাকার কোন এক শিশু-বিদ্যালয়ে তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইত। এই খানে তিনি মহারাষ্ট্র ভাষায় কয়েক খানি শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন। সেই বইগুলি তদ্দেশীয় পুস্তকের ন্যায় চিত্রিত করিবার ইচ্ছা করিয়া ছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

কয়েক বৎসর হইল, তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং পুণা নগরে ১৮৮৯ সালের ১১ই মার্চ্চ শুক্রবার "সারদা-সদন" নামে অনাথা বিধবাদের জন্য এক আশ্রম সংস্থাপন করিয়া প্রাণ মন ঢালিয়া খাটিতেছেন। রমাবাইয়ের ন্যায় জ্ঞান-পিপাসু, সদাশয়া, পুণ্যবতী, বিদুষী নারী ভারতের ঘরে ঘরে কবে দেখিব?

ফ্রান্সেস্ রিড্‌লী হেভারগেল।

ন্সেস্ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ওয়ারচেষ্টার শায়ারের সমীপবর্ত্তী আষ্টল নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম উইলিয়ম হেনরী হেভারগেল। ভাই ভগিনীদের মধ্যে তিনি সর্ব্ব কনিষ্ঠা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী মিরিয়ম, রিড্‌লীর বাল্যজীবন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বলিয়া গিয়াছেন,—"ফ্রান্সেসের বাল্যলীলা যখন আমার স্মৃতিপথে জাগে, তখন প্রাণের মধ্যে এক অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী শিশুর ছবি অঙ্কিত হয়। তাহার সেই সুন্দর মুখশ্রী, কুঞ্চিত কেশ, মুখভরা হাসি এবং নানাবিধ বালসুলভ চাঞ্চল্য এখনো যেন আমার চক্ষুর উপর ভাসিতেছে। কচি বয়সেই তাহার অপূর্ব্ব মেধা এবং স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সে এক বার যাহা শুনিত, তাহা কখনও ভুলিত না। বাইবেলের ছোট ছোট গল্প গুলি তাহার শৈশবেই কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। ছেলেবেলা আমরা সকলেই মায়ের কাছে পড়িতাম; কিন্তু আমার বিদ্যালয়ত্যাগের পর হইতেই রিড্‌লীর শিক্ষার ভার

ফ্রান্সেস্ রিড্লী হেভারগেল।

আমার উপর অর্পিত হয়। প্রতিদিন প্রাতঃকালে সে আমার নিকট আধ ঘণ্টা মাত্র অধ্যয়ন করিত ; কিন্তু সেই আধ ঘণ্টাতেই সে যত দূর শিখিতে পারিত, অপর কোন মেয়ের পক্ষে ততটা শিখিতে বোধ হয় তাহার চতুর্গুণ সময় লাগিত। সে যখন পড়িবার জন্য বই হাতে করিয়া আমার নিকটে আসিত, তখন আমার বড়ই আনন্দ হইত। এমন ভাল মেয়েকে পড়াইতে কাহার না আনন্দ হয়? যখন রিড্লীর বয়স চারি বৎসর, তখনই সে বাইবেল এবং তৎসদৃশ অন্যান্য দুরূহ গ্রন্থ অনায়াসে সুন্দররূপে পড়িতে পারিত। অল্প বয়সেই সে বেশ সুমিষ্ট স্বরে, যথাযথরূপে তাল ও রাগিণী ঠিক

করিয়া, গাহিতে পারিত। তাহার সেই চারি বৎসর বয়সের সুন্দর জড়ানো জড়ানো হস্তাক্ষরের সহিত তুলনা করিলে অনেক বয়স্ক লোকের হস্তাক্ষরও নিকৃষ্ট বোধ হইত। এই প্রতিভাময়ী বালিকাকে যাহা দেওয়া হইত, তাহাই সে অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু এবম্বিধ শক্তি থাকা সত্ত্বেও, তাহার উপর বেশী চাপ দেওয়া হইত না। অনেক সময় দেখিয়াছি, অতিরিক্ত শিক্ষাভারে অনেক বালক বালিকা শৈশবেই মাটী হইয়া যায়। আমরা সেই ভয়ে তাহার উপর ততটা চাপ দিতাম না।

"১৮৫৯ সাল হইতে রিড্‌লী আপন জীবনী লিখিতে আরম্ভ করে। সেই কৌতূহলপূর্ণ জীবনকাহিনী পাঠ করিলে দেখা যায়, শৈশব হইতেই ধর্ম্মের প্রতি তাহার ঐকান্তিক ভক্তি ছিল। যদিও আমি তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তথাপি তাহার বিশ্বাস এবং অনুরাগের সহিত আপনার তুলনা করিয়া অনেক সময় লজ্জিত হইয়াছি। ছয় বৎসর বয়সে সে এক দিন কোন ভজনালয়ে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক এবং বাগ্মী ফিলপট্‌সের বক্তৃতা শ্রবণ করে। সেই বক্তৃতায় বিশেষ রূপে ঈশ্বরের করুণার কথা বিবৃত হইয়াছিল। বক্তৃতার পর হইতেই তাহার প্রাণ ঈশ্বর-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়। সেই অসাধারণ ব্যাকুলতা আমরণ সঞ্জীবিত ছিল। যখন একটুকু বড় হইল, তখন ব্যাকুল হইয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ পূর্ব্বক 'আমায় দেখা দেও' 'আমায় দেখা দেও' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিত। সেই ব্যাকুল ভাব দেখিলে, অবিশ্বাসী নাস্তিকের মস্তকও অবনত হইয়া যাইত। যখনই কোন প্রচারকের সহিত তাহার দেখা হইত, তখনি সে ঈশ্বর-দর্শন সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিত। কিন্তু কোন কোন ধর্ম্মব্যবসায়ী প্রচারক, সেই কথা শুনিয়া উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময়

তাহাকে নিরাশ করিয়া দিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন, যথারীতি গির্জ্জায় বক্তৃতা দিলেই এবং চক্ষু মুদিয়া উপাসনায় যোগ দিলেই সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম হইল। রিড্লী কোন কোন প্রচারকের এবম্বিধ ঔদাস্য দর্শনে প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইত।”

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে হেভারগেলপত্নী পীড়িত হন। সেই সময় রিড্লীর বয়স অতি অল্প। কিন্তু সেই অল্প বয়সেই তিনি পীড়িতা জননীর যেরূপ সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা অনেক বয়স্কা বালিকাও পারে কিনা সন্দেহ। কিছু কাল পরে হেভারগেলপত্নী মৃত্যুমুখে পতিত হন। মায়ের মৃত্যুতে রিড্লী এত দূর ব্যথিতা হইয়াছিলেন যে, বাড়ীর নিকট দিয়া কোন শব যাইতে দেখিলেই মাটীতে পড়িয়া ‘মা’ ‘মা’ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। সাধারণতঃ লোকে যত কাল শোক চিহ্ন ধারণ করে, রিড্লী মায়ের মৃত্যুতে ততোধিক কাল শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়া ছিলেন। মাতৃবিয়োগের পর তাঁহার ঈশ্বর-দর্শনস্পৃহা প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। ১৮৫০ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে রিড্লী বেলমোণ্ট বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তথায় কিছু-কাল অবস্থিতির পর ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহার কোন প্রিয় সখীকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—“প্রিয় সখি নেলী! আমি বড় দুর্ভাগিনী। আজও আমি প্রাণ মন দিয়া প্রভুকে ভালবাসিতে পারিলাম না। আমার কি গতি হ’বে ভাই?” ইহার কিছুকাল পর, উল্লিখিত বিদ্যালয়ে একটী ‘তত্ত্ব-বিদ্যা-সমিতি’ সংস্থাপিত হয়। তথায় কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হইত। এক দিন তিনি জনৈক সতীর্থাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—“আমি শত চেষ্টা করিয়াও ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন করিতে পারিতেছি না। কি করিলে এ দুর্ভাগিনীর ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়, বলিতে পার?” সেই সতীর্থা তদুত্তরে

বলিয়াছিলেন,—"মহাজনরচিত গ্রন্থাদি পাঠ কর। যিনি পাপীদের জন্য প্রাণ ত্যাগ করিয়া ছিলেন, সেই মহাত্মা ঈশার পদানুসরণ কর, আশা মিটিবে।" প্রত্যুত্তরে রিড্‌লী বলিয়াছিলেন,—"জ্ঞানের কথা শিখিয়াছি, পড়িয়াছি, তথাপিও প্রাণের তৃষা মিটিল না। কি করিব কিছুই বুঝিতেছি না।" অবশেষে ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কুমারী কুকের সহিত উইলিয়ম হেন্‌রী হেভারগেলের পরিণয় হয়। এই কুমারী কুক্ অতি ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। তিনি ফ্রান্সেস্ রিড্‌লীর অসাধারণ ব্যাকুলতায় প্রীত হইয়া বলিলেন,—"রিড্‌লী, তুমি কেন কাঁদ? ভগবানকে আত্মসমর্পণ কর। তুমি তাঁহাকে বিশ্বাস কর। তিনি তোমার কল্যাণ করিবেন। তুমি এ কথা কি শুন নাই, 'যে তাঁহার উপর নির্ভর করে, তিনি তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন।' তাঁহার উপর নির্ভর কর। যাহা করিতে হয় তিনি করিবেন।" রিড্‌লী এই সুসমাচার অবগত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। বহুদিন পরে প্রাণরাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়া বিষাদ দূরীভূত হইল।

১৮৫১ সালে তিনি পোকউইককোর্টস্থ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। কিন্তু তথায় যাওয়ার পরই মুখে বহুল পরিমাণে স্ফোটক হওয়ায় চিকিৎসকের উপদেশানুসারে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে এবং দীর্ঘ কালের জন্য পাঠকার্য্য বন্ধ রাখিতে বাধ্য হন। তৎপর কিছুকাল ওয়েল্সে ছিলেন। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তদ্দেশীয় ভাষায় বিশেষরূপে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫২ সালে পিতার সহিত জার্ম্মেনীতে যান্। তথাকার কোন বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ে পরীক্ষা দেন, এবং একশত দশটী বালিকার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একটী সুন্দর পারিতোষিক লাভ করেন।

অবশেষে জার্ম্মেনী হইতে নানা বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া ১৮৫৪ সালের ১৭ জুলাই তারিখে স্বদেশে প্রত্যাগত হন এবং ওয়ারচেষ্টার কেথিড্রেলের প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও জার্ম্মেনী, ফরাসী এবং ইংরেজী ভাষায় অনেকগুলি কবিতা-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সেই বইগুলি পুস্তক-প্রচার-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ সালের গ্রীষ্মকালের মধ্যে তিনি দুরূহ হিব্রুভাষা শিক্ষা করিয়া, তৎভাষায় লিখিত সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই সময় তিনি দুর্নীতিপরায়ণ বালকদিগের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্তা হন। তিনি এই কার্য্যটী এত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, অবশেষে সেই দুর্দ্দম্য বালকদিগের মধ্য হইতেই একটী আচার্য্য এবং অপর একটী শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিল !

রিড্‌লী ১৮৬১ সালে ওকহাম্পটনস্থ তাঁহার ভগিনীর বাড়ীতে যাইয়া বাস করেন। সেই থানে অবস্থান কালে ভাগিনেয়ী দিগকে শিক্ষা দান করিতেন। অবশেষে তাহারা বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলে তিনি পুনর্ব্বার গৃহে ফিরিয়া আসেন। তৎপর আর একবার জার্ম্মেনিস্থ বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বদেশে আগমন পূর্ব্বক ১৮৬৭ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে "খ্রীষ্টীয়-মহিলা-সমিতির" সভ্য হন। এই খানে তিনি জর্ম্মণ ভাষা এবং সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। তাঁহার দ্বারা এই সমিতির অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইত। ১৮৭০ সালের এপ্রিল মাসে তাঁহার পিতার রোগ সমাচার শ্রবণ করিয়া আবার গৃহে যান। কিন্তু যাইতে না যাইতেই পিতার মৃত্যু হয়। এই বার তাঁহার প্রাণ ঐশ্বরিক ভাবে পূর্ণ থাকায়, পিতার শোকে ততটা আকুল হন নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার পিতা "মরেন

নাই, কেবল অগ্রে গিয়াছেন মাত্র" *। ইহার পর তিনি "Songs of Grace and Glory" নামে কয়েকখানি সঙ্গীত পুস্তক প্রচার করেন। তাহাতে তাঁহার প্রাণের ঐকান্তিক ধর্ম্মানুরাগ এবং কোমলত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

ইহার পর তিনি অনেকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং কিছু-কাল নানা উপায়ে নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৭৪ সালে রিড্‌লী একবার সুইজারলণ্ডে যান। সুইজারর্লণ্ড প্রকৃতির কাম্যবন। সে স্থান দেখিয়া তিনি অতিশয় মুগ্ধ হন্। এক মাস কাল সুইজারর্লণ্ডের স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন এবং তাহারই অন্তরালে সেই কৃপাময়ীর হস্ত নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য হন। দ্বিতীয় মাসে তিনি কয়েক খানি নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে "ঈশ্বর-বিষয়ক-চিন্তা' নামক গ্রন্থই অতীব সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

ইহার কিছু কাল পরে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং নানাবিধ চিন্তায় কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার রোগের মাত্রা এত বৃদ্ধি হইয়া-ছিল যে, তিনি বাঁচিবেন বলিয়া কাহারও মনে বিশ্বাস ছিল না। সেই রোগ যন্ত্রণার সময়েও তাঁহার সহাস্যমুখ ক্ষণেকের তরে ম্লান হয় নাই। তাঁহার মা যদি জিজ্ঞাসা করিতেন ঃ—"কি মা ফেনী (ফেনী, আদরের নাম) বড় কষ্ট হচ্ছে ?" তিনি লঘুস্বরে উত্তর করিতেন ঃ—"কিছুই না।" মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া ভয় হইতেছে কি না জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন ঃ—"মৃত্যুতে ভয় কি ? আমি যে পিতার কোলে ! তিনি যখন আমায় কোলে করিয়া আছেন, তখন আর ভয় কি ?" যতদিন শয্যাশায়িনী ছিলেন, অবিশ্রান্ত কেবল প্রার্থনা করিতেন। অতিশয়

* "Not lost, but gone before."

যন্ত্রণার সময়েও বিন্দুমাত্র মুখ বিকৃতি না করিয়া কেবল ভগবানের নাম করিতেন। অবশেষে অনেক দিন ভুগিয়া সে বারের মত আরোগ্য লাভ করেন। আরোগ্য লাভের পর তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গকে যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সকলকেই এই কথাটী লিখিয়াছিলেন—"আমার আরোগ্যলাভে তাঁহারই ইচ্ছা জয়যুক্ত হইয়াছে। আপনারা তাঁহার করুণা দেখিয়া ধন্য হউন্।" ইহার পরে আবার অনেকগুলি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

আরোগ্য লাভের পর, বিশ্রাম না করিয়াই আবার ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারে নিযুক্ত হন; এবং প্রাণপণে বিশুদ্ধ মত ও বিশ্বাস চতুর্দ্দিকে প্রচার করেন। ১৮৭৮ সালের খ্রীষ্টের জন্মোৎসবে যখন সকলে মত্ত, তখন রিড্লী ভগ্ন শরীরে অতিরিক্ত পরিশ্রম বশতঃ আবার পীড়িত হন। তিনি এক মুহূর্ত্তও বিনা কার্য্যে ব্যয় করা পাপ বোধ করিতেন! সেই রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়াই তিনি অনেকগুলি "মটো"* তৈয়ার করেন। শ্বাস ফেলিতে যতটুকু সময় যায়, ততটুকু সময়ও তিনি বিনাকার্য্যে কর্ত্তন করেন নাই। তাঁহার কার্য্যকরী শক্তি এমনই প্রবল ছিল! তিনি যেমন সঙ্গীত রচনায় পটু ছিলেন, তেমনি তাঁহার কণ্ঠস্বরও অতীব মিষ্ট ছিল। তিনি পিয়ানো বাজাইতে বাজাইতে যখন গান করিতেন, তখন বিপিনবিহারী পক্ষীর কলকণ্ঠের কথা মনে পড়িত। তাঁহার স্বর এমনি মিষ্ট, এমনি মধুর ছিল! তিনি যখন সুইজারলণ্ডে ছিলেন, তখন তথাকার অধিবাসিবর্গ তাঁহার গান শুনিয়া ছুটিয়া আসিত। বালিকারা গান শুনিবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তাঁহার সমস্ত শক্তিই অসাধারণ ছিল। সাত বৎসর বয়সেই তাঁহার কবিত্ব শক্তি পরিস্ফুট হয়।

* ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশ।

১৮৬০ সালে যখন তাঁহার দুই একটী মাত্র কবিতা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখনই সাময়িকপত্রের সম্পাদকগণ তাঁহার নিকট হইতে কবিতা পাইবার জন্য হাঁটাহাঁটি করিতেন। ১৮৬৩ সালে কয়েকটী কবিতা লিখিয়া তিনি দশ পাউণ্ড সতের শিলিং এবং ছয় পেন্স উপার্জ্জন করেন। তন্মধ্যে দশ পাউণ্ড পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন, অবশিষ্ট ধর্ম্মার্থে ব্যয় করেন।

তিনি যে দিন যে বিষয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, তাহার একটা তালিকা রাখিতেন। নিম্নে তাহার একটু আভাস দিতেছি,—

প্রার্থনার তালিকা।

সোমবার	...	...	আনন্দ ও শান্তি।
মঙ্গলবার	...	...	সহিষ্ণুতা।
বুধবার	...	...	শিষ্টতা।
বৃহস্পতিবার	...	...	পবিত্রতা।
শুক্রবার	...	...	বিশ্বাস।
শনিবার	...	...	মিতাচার।
রবিবার	...	...	(ভজনালয়ের কার্য্য)।

প্রার্থনার পর কি রূপ ফল লাভ করিতেন, তাহাও তালিকার পার্শ্বে লিখিয়া রাখিতেন। অনেককে দেখা যায়, সকালে কি প্রার্থনা করিলেন, বৈকালে তাহা মনে নাই। তিনি সেই প্রকৃতির ছিলেন না। অমুক মাসে, অমুক দিনে কি প্রার্থনা করিয়া কত দূর ফল পাইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট রূপে বলিতে পারিতেন।

ইহার পর তিনি কিছু কাল মাদক দ্রব্যের অপকারিতা সম্বন্ধে

বক্তৃতা করেন এবং অনেকগুলি লোককে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিবারণ করেন। তৎপরে 'প্রভাতের তারা' নামে আর একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াই জ্বররোগে শয্যাশায়িনী হন। কেহ যদি বলিত, "আপনি এত খাটিয়া খাটিয়াই শরীরটাকে মাটী করিলেন।" তিনি উত্তর করিতেন—"ভাই! আমি কে? এ শরীর ত তাঁহার। তাঁহার সামগ্রী তাঁহারই কার্য্যে লাগিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর সুখ কি?" ক্রমে জ্বর প্রবল হইয়া উঠিল। শরীর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িল। চিকিৎসকের চিকিৎসা পরাভূত হইল। ঔষধ খাওয়াইতে গেলে বলিতেন,—"তোমরা আমাকে আর রাখিতে পারিবে না। পিতা ডাকিয়াছেন, বাড়ী যাইব।" মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিলে পূর্ব্ববৎ বলিতেন,—"কোন ভয় নাই। তোমরা সকলে তাঁহার ইচ্ছার জয় দেখিয়া ধন্য হও।" এইরূপ বিশ্বাসের পতাকা উড়াইয়া, আত্মীয় বন্ধু সকলকে কাঁদাইয়া, ১৮৭৯ সালের ৩রা জুন তারিখে ৪২ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। কুমারী ফ্রান্সেস্ রিড্‌লীর মৃত্যুতে ইয়ুরোপের যে ক্ষতি হইয়াছে, সে অভাব কত দিনে পূর্ণ হইবে, কে বলিতে পারে?

কুমারী গ্রেস্ ডার্লিং।
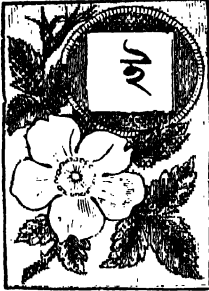
ইয়ুরোপের অন্তর্গত নর্থাম্বারলেণ্ডের উপকূলের নিকটে প্রায় পঁচিশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই দ্বীপপুঞ্জে জন মানবের বসতি নাই, সুন্দর শ্যামল বৃক্ষ লতাও নাই। দূর হইতে তাকাইলে কেবল একত্রীভূত শুভ্র বরফ রাশির ন্যায় দৃষ্টি গোচর হয়। এই দ্বীপগুলির নাম ফার্ণ-দ্বীপপুঞ্জ। তন্মধ্যে লংষ্টোন নামক দ্বীপটীই কুমারী গ্রেস্ ডার্লিঙ্গের গুণে ভুবন বিখ্যাত হইয়াছে। লংষ্টোনে জনমানব এবং তরুলতা না থাকিলেও অন্যান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না। ফেনিল অম্বুরাশি যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরী তুলিয়া লংষ্টোনের পাদ-দেশ বিধৌত করিত, তখন শুভ্র চন্দ্রালোকে তাহার চারিদিক চিক্‌মিক্ করিয়া উঠিত। সময় সময় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ-মালার ঘাত প্রতিঘাতে সে জন শূন্য দ্বীপটী প্রতিধ্বনিত হইত। সামুদ্রিক পাখীরা যখন পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িতে উড়িতে সুমধুর স্বরে গান গাহিত, তখন চারিদিক মধুময় হইয়া উঠিত। এই

কুমারী গ্রেস্ ডার্লিং।

দ্বীপের এক প্রান্তে একখানি কুটীর ছিল। তাহাতে স্থানীয় * আলোক মঞ্চের অধ্যক্ষ, আপন পত্নী ও একটী কন্যা লইয়া বাস করিতেন। কন্যাটীর নাম গ্রেস্‌ডার্লিং। গ্রেস যেন প্রকৃতির ক্রোড়েই লালিত পালিত হইয়াছিলেন! তিনি পিতা মাতার কার্য্যে সাহায্য

* নিশীথ সময়ে পোত শ্রেণী বিপথগামী হইয়া যাহাতে বিপদে না পড়ে, তজ্জন্য স্থানে স্থানে এক একটী আলোক-মঞ্চ থাকে। গ্রেসের পিতা এবম্বিধ একটী আলোক মঞ্চের অধ্যক্ষ ছিলেন।

করিয়া যে সময়টুকু পাইতেন, তাহা পাখীর গান শুনিয়া, সমুদ্রের লহরীমালা নিরীক্ষণ করিয়া, বেলাভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে উপলখণ্ড কুড়াইয়া, গভীর নিশীথে চাঁদের সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া, অতিবাহিত করিতেন। এইজন্য কোন কোন কবি গ্রেস্‌কে 'প্রকৃতিবালা' বা "সিন্ধুকন্যা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। সেখানে অপর কোন জনমানবের বসতি না থাকায় গ্রেস্ বিন্দুমাত্রও দুঃখিত ছিলেন না। বিশেষ মূল্যবান কোন গৃহ সামগ্রী না থাকিলেও তিনি আপন কুটীরখানিকে স্বর্গতুল্য মনে করিতেন। গ্রেস্ যখন গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পিতা মাতার কার্য্যে সাহায্য করিতেন, তখন তাঁহার সে মূর্ত্তি দেখিলে বুঝিবা জ্ঞানী ব্যক্তিরও হিংসার উদ্রেক হইত! তিনি যদিচ বিশেষ রূপবতী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সুচিক্কন মুক্ত কেশরাশি যখন বায়ুভরে মুখের চারিদিকে আসিয়া ঝুলিয়া পড়িত, তখন তাঁহার মুখখানিতে এমনই এক স্বর্গীয় শোভা প্রতিভাত হইত যে, তাহা দেখিয়া সৌন্দর্য্যগ্রাহী ব্যক্তি মাত্রেই মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিতেন না।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের এক দিন রাত্রে একখানি সুবৃহৎ জাহাজ ফার্ণদ্বীপপুঞ্জ এবং ঐ উপকূলের মধ্য দিয়া উত্তরাভিমুখে যাইতেছিল। সেই সময় অকস্মাৎ প্রবল বাতাস বহিয়া জাহাজ খানিকে কাঁপাইয়া তুলিল, এবং ঝড়ের প্রকোপে সমুদ্রবক্ষে ঢেউ উঠিতে লাগিল। ভীষণ তরঙ্গাঘাতে স্বল্প সময়ের মধ্যেই জাহাজের একপার্শ্ব কিয়ৎ পরিমাণে ভাঙ্গিয়া গেল। জাহাজের সূত্রধর সুচারুরূপে তাহা সংস্কার না করিয়াই আলস্যে সময় যাপন করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড ছিদ্র হইয়া জাহাজে জল উঠিতে লাগিল। তখন সকলে ভীত ও ব্যাকুল হইয়া ত্রাস্তভাবে তাহা সংস্কার করিতে

লাগিল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সকল চেষ্টাই বিফল হইল। উত্তাল জলস্রোতে মুহূর্ত্ত মধ্যেই ইঞ্জিনের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া জাহাজের গতি রহিত হইল এবং হাল ভাঙ্গিয়া গিয়া জাহাজখানি বায়ুভরে চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। অবশেষে পর্ব্বতাকার তরঙ্গাঘাতে জাহাজখানি সমুদ্রের অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইল। পোতাধক্ষ এবং বহুসংখ্যক আরোহী প্রাণ হারাইলেন। কেবল কয়েকটী দুর্ভাগ্য ব্যক্তি মাস্তুল জড়াইয়া ধরিয়া রহিল। কিন্তু তাহারাও আবর্ত্তের সহিত ভাসিয়া চলিল!

যখন পূর্ব্বাকাশে অরুণরেখা ফুটিয়া উঠিল, তখন প্রকৃতিবালা গ্রেস্ ঝটিকাময়ী পারাবারের সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য আলোক মঞ্চের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বল্পক্ষণের মধ্যেই অদূরে একটা কি ধবলাকার পদার্থ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি কৌতূহল পরবশ হইয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলেন,—একখানি ভগ্নজাহাজের অৰ্দ্ধখণ্ড সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গাঘাতে নাচিতে নাচিতে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ভগ্ন-জাহাজ-খণ্ডে যে সকল দুর্ভাগ্য ব্যক্তি রহিয়াছে, তাহারা প্রাণরক্ষার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতেছে না। গ্রেস্ ভাবিলেন,—"চোখের উপর এতগুলি প্রাণ বিনষ্ট হইতে দেখিয়া আমি কোন্ সুখে গৃহে বসিয়া থাকিব? যে প্রকারে হউক, ইহাদিগকে উদ্ধার করিতেই হইবে।" গ্রেস্ ক্ষুদ্র বালিকা বটে, কিন্তু এই অভাবনীয় ঘটনায় তাঁহার প্রাণ আজ নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি পিতাকে ডাকিয়া আনিয়া দূরবীক্ষণের সাহায্যে সেই ভীষণ দৃশ্য দেখাইলেন এবং সেই দুর্ভাগ্যদের উদ্ধারার্থে কোন উপায় অবলম্বন করিতে বলিলেন। গ্রেসের পিতা সেই ভীষণ

দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া কিছু ক্ষণ পরে বলিলেন,—"নৌকা করিয়া গেলে ইহাদিগকে রক্ষা করিলেও করা যাইতে পারে ; কিন্তু যাহারা যাইবে, তাহাদের বাঁচিবার আশা অতি অল্প।" গ্রেস্ যে সে বিপদের কথা জানিতেন না, এমন নহে। তথাপি তিনি বলিলেন,—"যদি রক্ষা করা যায়, তবে এখনি চল। তোমাতে আমাতে মিলিয়া এই বিপদগ্রস্তলোকদিগকে রক্ষা করিব। তুমি হা'ল ধরিও। আমি যথাসাধ্য দাঁড় টানিব। ইহাদিগকে মরিতে দেখিয়া কোন্ প্রাণে গৃহে বসিয়া থাকিবে ?"

পিতা।—মা, তোমার উৎসাহের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আজ সমুদ্রের অবস্থা কি ভীষণ দেখিতেছ না ? ঢেউতে যদি নৌকাখানি উল্টাইয়া ফেলে, তবে পিতা পুত্রীতে প্রাণ হারাইব। জানিয়া শুনিয়া এমন বিপদে পা দিবে মা ?

গ্রেস্ পিতার নিরাশ বাক্যে বিন্দু মাত্রও না টলিয়া বলিলেনঃ— "যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, আমরা মরিব। কিন্তু বাবা ! কোন প্রাণে আমরা এতগুলি লোককে এই অবস্থায় পতিত দেখিয়া মুখে অন্ন জল তুলিব ? চল, এখনি চল। এতক্ষণে বুঝিবা তাহাদের জীবন শেষ হইল।" দয়াবতী পুত্রীর উৎসাহ পূর্ণ বাক্যে বৃদ্ধ আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। সজলনেত্রে গদ্ গদ্ কণ্ঠে বলিলেন—"চল।"সেই মুহূর্ত্তেই এক খানি ক্ষুদ্র তরণী আনীত হইল। পিতা হা'ল ধরিলেন, গ্রেস্ প্রাণপণে দাঁড় টানিতে লাগিলেন। তখন স্রোত ও বায়ু সম্পূর্ণ প্রতিকূল ! কিন্তু যেখানে স্বর্গীয় বল অবতীর্ণ হয়, যেখানে সংসারের কোন বিঘ্নই দাঁড়াইতে পারে না। স্বল্প সময়ের মধ্যেই পিতা পুত্রী সেই ভীষণ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই দুর্ভাগ্যগণ জীবনের আশা এক প্রকার পরিত্যাগই করিয়াছিল। তাহারা যখন

গ্রেস্ ডার্লিং পিতার সহিত নৌকা লইয়া যাইতেছেন।

দেখিতে পাইল, তাহাদের উদ্ধারার্থ একখানি নৌকা করিয়া একটী বালিকা এবং এক জন বৃদ্ধ আসিতেছে, তখন তাহারা যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল। তৎপরে স্বল্প সময়ের মধ্যেই নয় জন বিপদ-গ্রস্ত নরনারী, গ্রেস্ ও তাহার পিতার যত্নে নিরাপদে লঙ্ষ্টোনে উত্তীর্ণ হইল। যখন সেই বিপদগ্রস্ত নরনারীগণ রক্ষা পাইল, তখন গ্রেস্ আনন্দের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই রাত্রে তিনি যে সুখানুভব করিয়াছিলেন, এমন সুখ অতি অল্প নরনারীর ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। তিনি অত্যধিক আনন্দে সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও চক্ষু মুদিতে পারেন নাই।

অবশেষে সেই বিপদ-গ্রস্ত নরনারীগণ যখন দেশে গমন করিয়া কুমারী গ্রেসের এই মহৎ কার্য্যের কথা প্রচার করিল, তখন সমগ্র ইয়ু-

রোপবাসী একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। হাটে, বাজারে, নগরে, পল্লীতে, বিপণীতে গ্রেসের ছবি নানা আকারে বিক্রীত হইতে লাগিল। গ্রেস্ নানা স্থান হইতে রাশি রাশি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১০৫০০ দশ হাজার পাঁচশত টাকার একটী উপহার আসিয়াছিল। এই সব উপহার পাইয়া তিনি বিন্দুমাত্রও গর্ব্বিত হন নাই। বরং তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, প্রেম, ও বিনয়ের মাত্রাই দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই ঘটনার তিন বৎসর পরেই ক্ষয়কাস রোগে গ্রেস্ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। গ্রেসের প্রার্থিব দেহ লোপ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনসৌন্দর্য্য পৃথিবীতে চিরকাল অক্ষুন্ন থাকিবে।

বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী।

গরীব দুঃখীর বন্ধু, বঙ্গমাতার সুসন্তান, ভারতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, বিধবাসুহৃদ্ পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী ভগবতী দেবীর জীবনী এক অতি উপাদেয় সামগ্রী। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল গুণে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাহার মূল যে তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী, এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। লোকে কথায় বলে—"যেমন গাছ, তেমনি ফল"। এ কথার স্বার্থকতা ভগবতী ও বিদ্যাসাগরচরিত্রে পূর্ণ মাত্রায় দৃষ্ট হইয়াছিল। দয়া, ধর্ম্ম ও সেবার যে মৃদু মধুর তান ভগবতীর প্রাণ-তন্ত্রীতে বাজিয়াছিল, তাহাই দীর্ঘকাল পরে বিদ্যাসাগর-চরিত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। এই জন্যই ঈশ্বরচন্দ্র আপন জননীকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা মনে করিয়া পূজা করিতেন। বস্তুতঃ এমন মা অতি অল্প সন্তানের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী।

১৭২৪ শকাব্দের ২৭শে ফাল্গুন তারিখে, হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমার পশ্চিম গোঘাট গ্রাম নিবাসী ধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিত রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঔরসে এবং পাতুলগ্রাম নিবাসী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের পুত্রী গঙ্গামণি দেবীর গর্ভে, ভগবতী জন্মগ্রহণ করেন। রামকান্ত শৈশব হইতেই ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন। তিনি বাটীতে চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া শিক্ষা দান করিতেন বটে, কিন্তু সময় ও সুবিধা পাইলেই নির্জ্জন শ্মশানে বসিয়া গভীর নিশীথে

শব সাধনা করিতেন! তিনি শেষাবস্থায় মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেবল মধ্যে মধ্যে "মঞ্জুর" এই শব্দটী উচ্চারণ করিতেন। তন্ত্রশাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় অধিকার এবং অনুরাগ ছিল। পরে যখন ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হইল, তখন রামকান্ত সমস্ত বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া শ্মশানেই পড়িয়া থাকিতেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় জামাতার সংসারবিরাগের কথা শ্রবণ করিয়া দুহিতাকে সসন্তান পাতুল গ্রামে লইয়া আসেন। ভগবতীর আর একটী মাত্র সহোদরা ছিলেন। গঙ্গামণি এই দুইটী দুহিতাকে লইয়া আমরণ সুখে স্বচ্ছন্দে পিতৃগৃহে বাস করিয়াছিলেন। পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের দুইটী কন্যাও চারিটী পুত্র ছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, মধ্যম রামধন তর্কবাগীশ, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ শিরোমণি ও সর্ব্বকনিষ্ঠ বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার। এই পরিবারটী দয়া, ধর্ম্ম, ও আতিথ্যের জন্য সুবিখ্যাত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্বরচিত জীবনীর এক স্থানে এই পরিবার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, —"অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্য্যা এই পরিবারে যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ ঐ অঞ্চলের কোন পরিবার এ বিষয়ে এই পরিবারের ন্যায় প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ফল কথা এই, অন্নপ্রার্থনায় রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ হইয়া কেহ কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে অবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যত অধিক হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়া সকলেই পরম সমাদর, অতিথি-সেবা ও অভ্যাগত পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ভগবতী দেবী এমন ধর্ম্মপ্রবণ পরিবারে প্রতি-

পালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার জীবন এত সুন্দর হইয়াছিল; এবং দুর্ভাগিনী বঙ্গমাতা বহুকাল পরে নৈশাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ বিদ্যাসাগরের ন্যায় রত্নলাভেও সমর্থা হইয়াছিলেন। সন্তানগণকে ন্যায়, ধর্ম্ম, দয়া ও পবিত্রতা শিক্ষা দিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে পরিবার যে ভাল হওয়া উচিত, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাতুল গ্রামের এই বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পরিবার! যে সেবাবৃত্তি ভগবতী ও বিদ্যাসাগর চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার মূল যে সেই বিদ্যাবাগীশ পরিবার, তাহা কে অস্বীকার করিবে? পরে ১৭৩৫ শকাব্দে বনমালীপুর গ্রামনিবাসী রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এই ভগবতী দেবীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়, এবং ইঁহাদেরই গৃহে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

ঠাকুরদাস যখন বালক, তখনই তাঁহার পিতা গৃহবিবাদে বিরক্ত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিতেন। ঠাকুরদাসের জননী দুর্গাদেবী নানা কারণে সহায়হীনা হইয়া স্বামীগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরসিংহা গ্রামে পিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু পিতৃগৃহে আসিয়াও তাঁহার দুঃখ নিবৃত্তি হইল না। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর পীড়নে পিত্রালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই গ্রামেই একখানি ক্ষুদ্র আবাস নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। সারা রাত্রি চরকায় সূতা কাটিয়া এবং অন্যবিধ শারীরিক পরিশ্রমে দুঃখিনী দুর্গা আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান্ বালক ঠাকুরদাস মায়ের দুঃখে কাতর হইয়া কলিকাতা আগমন পূর্ব্বক অতি কষ্টে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অল্প বেতনে একটী চাকুরী পান। তখন খাদ্য সামগ্রীও সুলভ ছিল। সুতরাং তখন অল্প আয়েতেই লোকে সন্তুষ্ট থাকিত। ঠাকুরদাসের বেতন আট টাকা হইয়াছে শুনিয়া দুর্গাদেবীর পর্ণ-

কুটীরে আনন্দোৎসব হইল। যাঁহারা তাঁহার সুখ দুঃখের সমভাগী ছিলেন, বলা বাহুল্য তাঁহারা এ উৎসবের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে রামজয় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সতী সাধ্বী স্ত্রী দুর্গা ও প্রিয়তম পুত্রের অধ্যবসায় এবং কষ্ট সহিষ্ণুতার কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হন এবং ঠাকুরদাস চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলে, উল্লিখিত ভগবতীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন।

পুত্রের বিবাহ দিয়া রামজয় মনে করিলেন,—"ঠাকুরদাস এখন উপার্জ্জনশীল হইয়াছে, স্বচ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিবে। সুতরাং আমি আর কেন সংসারমায়ায় বদ্ধ হইয়া থাকি?" এই ভাবিয়া পুনর্ব্বার গৃহত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন; কিন্তু এবারেও তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। এক দিন নিশীথ সময়ে কেদারপাহাড়ে স্বপ্নে দেখিলেন, কোন মহাপুরুষ যেন তাঁহাকে বলিতেছেন:—"রামজয়, তুমি পরিবার পরিজন ত্যাগ করিয়া ভাল কাজ কর নাই। সত্বর তুমি স্বদেশে যাও। তোমার বংশে এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার দয়া, ধর্ম্ম, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে তোমার বংশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। ভগবান্ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তুমি সত্বর গৃহে প্রতিগমন কর।" রামজয় এই আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়া সত্বর গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং ছয় মাস কাল পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গৃহে উপনীত হইলেন। রামজয় বীরসিংহায় উপনীত হইয়া দেখিলেন—পুত্র ঠাকুরদাস কলিকাতায় চাকুরী করিতেছেন, এবং বধূমাতা ভগবতী অন্তঃসত্বা হইয়া উন্মাদিনী-বৎ হইয়াছেন। রামজয় অনেক চেষ্টা যত্ন করিয়া চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু কিছুতেই উন্মাদিনী ভগবতী আরোগ্য লাভ করিলেন না। অবশেষে রোগীকে উদয়গঞ্জ নিবাসী খ্যাতনামা জ্যোতিষী ভবানন্দ

শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখান হয়। তিনি ভগবতীর কোষ্ঠী এবং অবয়ব দেখিয়া বলিলেন—"ইহাঁর গর্ভে এক মহাপুরুষ বাস করিতেছেন। তাঁহারই প্রভাবে ইনি উন্মাদিনী হইয়াছেন। প্রসব হইলেই আরোগ্যলাভ করিবেন। কোন ঔষধ সেবন করান অনাবশ্যক।" অবশেষে ১৭৪২ শকাব্দার ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহর সময়ে প্রতিভা ও দয়ার সাক্ষাৎ অবতার ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রসবের পরই ভগবতীর রোগ বিদূরিত হইল।

ভগবতী যদিচ রূপবতী ছিলেন না, তথাপি তাঁহার মুখে এমন এক স্বর্গীয় মাধুর্য্য ছিল যে, দেখিলেই প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যাইত। আধুনিক বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ভগবতীর শ্রী সম্বন্ধে একস্থানে লিখিয়াছিলেন:—"ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসারতা, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়তনেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমাময় সুসংযত সৌন্দর্য্য দর্শকের হৃদয়কে বহুদূরে এবং বহুঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় এবং ইহাও বুঝিতে পারি, ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোন পৌরাণিক দেবী প্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।" * গরিব দুঃখীর দুঃখ দেখিলে ভগবতীর চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইত। ক্ষুধিতকে অন্নদান, তৃষাতুরকে জলদান, শীতক্লিষ্ট নরনারীকে বস্ত্র দান, রোগীকে ঔষধ ও পথ্য সেবন করান, ভগবতীর নিত্যব্রত ছিল। তাঁহার গৃহে কোন নবাগত অতিথি

* সাধনা ৪র্থ বর্ষ ২য় ভাগ ৩১৬ পৃষ্ঠা।

উপস্থিত হইলে কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়া যাইত না। কাহারও পীড়া হইয়াছে, ঐ দেখ ভগবতী ঔষধের শিশি এবং পথ্য-পাত্র হস্তে লইয়া ছুটিয়াছেন! কাহারও অর্থাভাব হইয়াছে, ঐ দেখ ভগবতী অঞ্চল-কোণে অর্থ বাঁধিয়া চুপি চুপি যাইতেছেন!! কেহ শীতে ক্লেশ পাইতেছে, আপনার শীতবস্ত্র দান করিতেছেন!!! জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের গৃহেই তাঁহার পদার্পণ হইত! তিনি ব্রাহ্মণকুমারী হইয়াও ভিন্ন জাতীয় নরনারীর মলমূত্র পরিষ্কার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।* একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়ীর জন্য কয়েকখানি লেপ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নূতন লেপগুলি পাইয়া ভগবতী ভাবিলেন, "পার্শ্ববর্ত্তী অনাথ অনাথারা শীতে মরিতেছে, আমি কোন্ প্রাণে এ লেপ গায়ে দিব?" তিনি তৎক্ষণাৎ লেপগুলি দরিদ্রদিগকে দান করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিয়া পাঠাইলেন "ঈশ্বর! তোমার প্রেরিত লেপগুলি অমুক অমুককে দিয়াছি,তুমি আরও লেপ পাঠাইবে।" দয়ার সাগর মাতৃদেবীর করুণার কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সেই মুহূর্ত্তে লিখিয়া পাঠাইলেন—"মা! বাড়ীর জন্য এবং গরিব দুঃখীদের জন্য আরও কত লেপের প্রয়োজন,সত্বর জানাইলেই পাঠাইয়া দিব।" যেমন মা, তেমনি ছেলে!!

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুজ স্বর্গীয় দীনবন্ধু ন্যায়রত্নও অতি উদার এবং পরোপকারী লোক ছিলেন। পরের দুঃখ দেখিলে তিনি আপনার সুখ দুঃখ ভুলিয়া যাইতেন। তিনি কাহাকেও বস্ত্রহীন দেখিলে আপন পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া দিতেন। একদিন দীনবন্ধু পাড়ায় বাহির হইয়া দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক একখানি ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া

* বিদ্যাসাগর-সহোদর শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের মুখে এই কথা শুনিয়াছি।

রহিয়াছে। তাহাতে তাহার লজ্জা নিবারিত হইতেছে না। দীন-বন্ধু এই দৃশ্যে স্থির থাকিতে না পারিয়া আপনার পরিধেয় বস্ত্রখানি তাহাকে খুলিয়া দিলেন এবং নিজে একখানি গামোছা পরিধান করিয়া গৃহে উপনীত হইলেন। ভগবতী পুত্রকে বস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যখন প্রকৃত বিষয় অবগত হইলেন, তখন প্রফুল্লমুখে বলিলেন—"বেশ কাজ করিয়াছ। আর একরাত্রি সূতা কাটিলেই তোমার একখানি কাপড় হইবে।" যখন পরিবারের আর্থিক অবস্থা এইরূপ শোচনীয়, তখনও ভগবতীর হস্ত গরিব দুঃখীর প্রতি মুক্ত ছিল।

বাড়ীতে কোন অতিথি উপস্থিত হইলে, ভগবতীদেবী স্বহস্তে পরি-বেশন করিয়া ভোজন না করাইলে নিরতিশয় কষ্টানুভব করিতেন। নবাগত ব্যক্তিদের যাহাতে কোন প্রকার ক্লেশ না হয়, তজ্জন্য তিনি প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। শরীর অসুস্থ থাকিলেও তিনি অতিথি-দিগকে আহার না করাইয়া শয়ন করিতেন না। অনেক বাড়ীতে দেখা যায়,বাড়ীর লোকেরা যে প্রকার সুখ সুবিধায় আহারাদি করে,অতিথি-দিগের জন্য তদ্রূপ করা হয় না। কিন্তু ভগবতীর গৃহে সে রূপ বৈষম্য ছিল না। সকলকে সমান ভাবে আহারীয় প্রদত্ত হইত। একবার স্কুলসমূহের ইনিস্‌পেক্টর প্রতাপ নারায়ন সিংহ ভগবতীর গৃহে অতিথি হন। ভগবতী দেবী একখানি থালায় করিয়া স্বহস্তে অন্ন আনয়ন করিলে, প্রতাপ নারায়ণ বলিলেন:—"বাড়ীর লোকেরা যে প্রকার শালপাতায় ভোজন করেন, আমিও তাঁহাদের এক সঙ্গে বসিয়া তদ্রূপ ভোজন করিব।" ভগবতী একথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তুমি বড় ঘরের ছেলে হইয়াও সকলের সহিত একত্রে বসিয়া শালপাতায় খাইতে চাহিতেছ? তোমার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ভগবান তোমার কল্যাণ

করুন।" † সিভিলিয়ান হেরিসন সাহেবকে একবার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়া ভগবতী স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া আহার করাইয়াছিলেন। তিনি সেই সময় যে প্রকার উদারতা এবং সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কোথাও দেখা যায় না। আমরা শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নরচিত "বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত" হইতে সেই চিত্রটী পাঠক পাঠিকাদের সম্মুখে ধরিয়া দিতেছি:—"হেরিসন সাহেবের তদন্ত কার্য্য সমাধা হইলে পর, অগ্রজ মহাশয় (বিদ্যাসাগর) হেরিসন সাহেবকে বীরসিংহাস্থিত বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। জননীদেবী সাহেবের ভোজন সময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। একজন বৃদ্ধ হিন্দু স্ত্রীলোককে ভোজনের সময় চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ও সাহেব পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সাহেব হিন্দুর মত জননীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনন্তর নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইল। জননী দেবী প্রবীনা হিন্দু স্ত্রীলোক, তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন অতিশয় উন্নত এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধনশালী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্, কি মূর্খ, কি উচ্চজাতীয়, কি নীচজাতীয়, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, কি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী সকলের প্রতিই তাঁহার সমদৃষ্টি। * * হেরিসন সাহেব দাদাকে বলিলেন,—"মাতার গুণেই আপনি এরূপ স্বভাবতঃ উন্নতমনা হইয়াছেন।" কথাবার্ত্তার শেষ হইলে হেরিসন ভগবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার অনেক টাকা আছে, না?"

† এই কথাটীও বিদ্যাসাগরসহোদর শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মুখে শ্রবণ করিয়াছি।

তদুত্তরে ভগবতী কর্ণিলিয়ার ন্যায়, ঈশ্বরচন্দ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেনঃ—"আমার টাকা পয়সার কোন আবশ্যক নাই। ইহাদিগকে রাখিয়া যাইতে পারিলেই সকল সাধ পূর্ণ হইবে।" ভগবতী দেবীর উদারতা এই খানেই শেষ হয় নাই। ১২৬৬ সাল হইতে ৭২ সাল পর্য্যন্ত যে সকল বাল-বিধবা বিবাহিতা হয়, তাহাদিগকে সাধারণ নরনারীগণ, এমন কি বাড়ীর বধূগণও হেয়জ্ঞান করিয়া নানা কথা কহিতেন। পাছে তাহারা এই সকল কথা শুনিয়া প্রাণে ক্লেশানুভব করে, তজ্জন্য ভগবতী দেবী তাহাদিগকে লইয়া এক থালায় ভোজন করিতেন! ইহা কি কম উদারতার কথা? যখন বঙ্গদেশের চারিদিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তখন এক জন ব্রাহ্মণকন্যা পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবাদের সঙ্গে এক পাত্রে আহার করিতেন, ইহা কি একটী অসাধারণ দৃষ্টান্ত নহে?

ভগবতীর দয়ার সীমা ছিল না। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার প্রাণ শতধা বিদীর্ণ হইত। ১২৭৫ সালের চৈত্রমাসে যখন বীরসিংহাস্থ বাটী আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গেল, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় জননীকে বর্দ্ধমানে আনয়ন করেন। ভগবতী তথায় পঁহুছিয়া দেখিলেন—বীরসিংহার মত অতিথি অভ্যাগত নাই, এবং দীন দরিদ্র পাঠার্থীদের অথবা রোগক্লিষ্ট নরনারীদের সেবা করিবারও সুযোগ নাই। কেবল নিষ্কর্ম্মা হইয়া গৃহে বসিয়া কাল কর্ত্তন করিতে হয়। তখন তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। তিনি বলিয়াছিলেনঃ—"আমি যদি বীরসিংহায় না যাই, তবে যে সকল দরিদ্র বালক আমার গৃহে আহার করিয়া স্কুলে পড়িত, কে তাহাদিগকে আহার করাইবে? তাহাদিগকে কে স্নেহ করিবে? দিবা দ্বিপ্রহরে যে সকল পরিশ্রান্ত

পথিক অতিথি হন, কে তাহাদের পরিচর্য্যা করিবে? নিরাশ্রয় আত্মীয় কুটুম্ব আসিলে, কে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিবে? যদি কোন অসহায় পীড়িত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, কে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবে? এতগুলি লোককে অকূল পাথারে ভাসাইয়া আমি কোনরূপে এখানে থাকিতে পারি না। তুমি সত্বর আমাকে বীর-সিংহায় পাঠাইয়া দেও।" ঈশ্বরচন্দ্র মাতৃদেবীর অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে সত্বর বীরসিংহায় পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আর একবার জননীকে কলিকাতায় আনিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু উল্লিখিত কারণে আনিতে পারেন নাই।

স্বর্ণালঙ্কারের প্রতি ভগবতীর নিরতিশয় বিদ্বেষ ছিল। তিনি বলিতেন,—"গহনা দিয়ে কি হইবে? ও ত এক দিনেই চোর ডাকা'তে লইয়া যাইতে পারে! বরং এই অর্থে উপায়হীন কুটুম্ব, দরিদ্র ও পাঠার্থীদের অনেক সাহায্য হইবে।" একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"মা! একদিন ঘটা করিয়া পূজা করা ভাল, না সেই অর্থে গরিব দুঃখীর উপকার করা ভাল"? দয়াময়ী ভগবতী বলিয়াছিলেন,—"যদি সেই অর্থে গরিব দুঃখীর উপকার হয়, তবে পূজার কোন আবশ্যকতা নাই" !!! কোনও হিন্দুগৃহে এমন ছবি দৃষ্টি-গোচর হয় কি? তাঁহার রুচি অতি মার্জ্জিত ছিল। তিনি নিরক্ষরা হইলেও অন্যান্য রমণীদের ন্যায় সূক্ষ্ম বস্ত্র পছন্দ করিতেন না। এমন কি বাড়ীর কোন স্ত্রীলোককে সূক্ষ্ম-বস্ত্র পরিধান করিতে দিতেন না। কখনও কেহ সূক্ষ্ম-বস্ত্র প্রেরণ করিলে যৎপরোনাস্তি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন! তিনি বাটীর স্ত্রীলোকদিগের জন্য নিজের পছন্দমত মোটা কাপড় আনিয়া দিতেন।

যে বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া

গিয়াছেন, তাহার মূল যে ভগবতীদেবী, একথা বোধ হয় অতি অল্প লোকেই জানেন। একদিন ঈশ্বরচন্দ্র যখন বীরসিংহার চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পিতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তখন একটী বাল-বিধবা উপস্থিত হয়। ভগবতী তাহার সেই যোগিনীবেশ দেখিয়া প্রাণে নিরতিশয় ক্লেশানুভব করিয়া বলিয়াছিলেন:—"ঈশ্বর! পোড়া শাস্ত্রে কি এই দুর্ভাগিনীদের জন্য একটা ব্যবস্থা নাই?" ঈশ্বর চন্দ্র বলিলেন—"আছে, কিন্তু দেশাচার-বিরুদ্ধ।" তখন ঠাকুরদাস ও ভগবতী সমস্বরে বলিলেন—"যদি থাকে, তবে তুমি তাহা প্রচার কর। ইহাতে যদি আমরাও তোমার বিরুদ্ধে কথা বলি, তুমি গ্রাহ্য করিবে না।" সেই হইতেই বিদ্যাসাগর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

জননীকে বিদ্যাসাগর কি চক্ষে দেখিতেন, সে সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আছে। ১২৭৭ সালের ২রা ফাল্গুন তারিখে কাশীবাসী ঠাকুরদাসের পীড়ার সংবাদ পাইয়া ভগবতী দেবী, তাহার দ্বিতীয় পুত্র দীনবন্ধু ও তৃতীয় পুত্র শম্ভুচন্দ্রকে লইয়া কাশীযাত্রা করেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ধনশালী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কাশী আসিয়াছেন শুনিয়া সমস্ত কেশেল বাঙালী ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অর্থের জন্য আসিয়া ধরিয়া বসিল। তাহারা বলিল—"বড় লোক কাশী দর্শনার্থ আগমন করিলে আমরা তাঁহাদের নিকট যাইয়া বলিলেই তাঁহারা আমাদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিয়া থাকেন, তাহাতেই আমাদের কাশীবাস হইতেছে। তুমি নামজাদা লোক, তোমাকে অবশ্য দান করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর করেন,—"আমি কাশীদর্শন করিতে আসি নাই, পিতৃ দর্শনের জন্য আসিয়াছি। আমি যদি তোমাদের মত ব্রাহ্মণকে কাশীতে দান করিয়া যাই, তাহা হইলে আমি কলিকাতায় ভদ্র-

লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিব না। তোমরা যত প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিতে হয় তাহা করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশীবাস করিতেছ। এখানে আছ বলিয়া তোমাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মত নরাধম আর নাই।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—"আপনি কি তবে বিশ্বেশ্বর মানেন না?" ইহা শুনিয়া দাদা উত্তর করিলেন—"আমি তোমাদের বিশ্বেশ্বর মানি না। * * আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান। দেখ জননীদেবী আমাকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়া কতই কষ্টভোগ করিয়াছেন। বাল্যকালে আমাকে স্তন-দুগ্ধ পান করাইয়া পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমি পীড়িত হইলে জননী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কিসে আমি আরোগ্য লাভ করি, নিরন্তর এই চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। * * * সুতরাং এতাদৃশ জনক জননীকে পরমেশ্বর জ্ঞান করি। ইঁহাদের উভয়কে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। ইঁহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিলে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন।" ব্রাহ্মণেরা কিছু না পাইয়া ক্রোধান্ধ হইয়া প্রস্থান করেন।" † ঠাকুরদাস ও ভগবতীকে বিদ্যাসাগর কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা ইহাতেই প্রতিপন্ন হইবে।

কিছুকাল পর ঠাকুরদাস আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু সতী-সাধ্বী ভগবতীদেবী ১২৭৭ সালের চৈত্র-সংক্রান্তি দিবসে বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইয়া কাশীধামেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। জননীর মৃত্যু-সংবাদে ঈশ্বরচন্দ্র এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে,

† শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন রচিত "বিদ্যাসাগর জীবন-চরিত" ২১২ পৃষ্ঠা।

সর্ব্বদা বালকের ন্যায় রোদন করিতেন। সাধারণতঃ লোকে একমাস কাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বৎসর কাল মাতৃ-বিয়োগ-জনিত শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। ভগবতীর ন্যা: আদর্শনারী বঙ্গগৃহে আর কি দেখিতে পাইব না?

সেলিনা, কাউণ্টেস্ অব্ হাণ্টিংডন্।

সেলিনা ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ডের অন্তর্গত লিসেষ্টার সায়ারের সমীপবর্ত্তী ষ্টানটন্ হেরল্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার দুইটী ভগিনী ছিলেন, কিন্তু শৈশব হইতে সেলিনাই বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি-শক্তিতে ভগ্নীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন। তিনি যে বড় হইলে এক জন বিদূষী, গুণবতী, আদর্শ-নারী হইবেন, তাঁহার শৈশব-জীবনেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যে বয়সে অপরাপর বালক বালিকারা বালসুলভ চাঞ্চল্যের বশবর্ত্তী হইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, সেলিনা সেই বয়সে গম্ভীরভাবে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। তাঁহার বয়স যখন নয় বৎসর, তখন তাঁহার সমবয়স্কা একটী বালিকার মৃত্যু হয়। যখন সেই বালিকাটীকে সমাধিস্থ করা হয়, তখন তিনিও সকলের সহিত সেই সমাধিস্থানে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার প্রাণে যে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল,

সেলিনা, কাউণ্টেস্ অব্ হাণ্টিংডন।

তাহা আমরণ ভুলিতে পারেন নাই। সেই দৃশ্য ত কত লোকেই দেখিয়াছিল, কিন্তু বালিকা সেলিনার হৃদয়ে সেই ছবি খানি যে ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল, তেমন বুঝি আর কাহারও হয় নাই। তিনি যখনি সময় পাইতেন, তখনি ঐ সমাধিস্থানে গমন করিয়া নীরবে কত কি চিন্তা করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি অপরাপর নারীগণের ন্যায় উপন্যাস বা তৎসদৃশ অন্য কোন প্রকার গ্রন্থ পাঠ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। তিনি সময় ও সুবিধা পাইলে বাইবেল এবং অপরাপর ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। প্রতিদিন ভগবানের নাম না করিয়া তিনি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ঈশ্বরোপাসনা তাঁহার জীবনের এক মাত্র সম্বল ছিল। যাহাতে কোন অপরিণামদর্শী, অধার্ম্মিক, দুশ্চরিত্র যুবকের সহিত তাঁহার পরিণয় না হয়, তজ্জন্য তিনি প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেন। ভক্তবৎসল ভগবান অচিরে তাঁহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে ডনিংটন্‌পার্ক নিবাসী হাণ্টটিংডনের নবম আর্ল থিওফিলাসের সঙ্গে তাঁহার উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই মিলনে উভয়েই সুখী হইয়াছিলেন। থিওফিলাস যদিও পরে সেলিনার সমস্ত কার্য্য অনুমোদন করিতেন না, তথাপি এক দিনের জন্যও তাঁহার কোন কার্য্যে বাধা দেন নাই।

পরে যে সকল সৎকার্য্যের জন্য সেলিনা এত বিখ্যাত হইয়াছিলেন, ডনিংটনপার্কে আগমনের পর হইতেই তাহা আরম্ভ করিলেন। তিনি ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে ধনীর গৃহে বিবাহিতও হইয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে সংসারের যাবতীয় ভোগ বিলাসে মত্ত থাকিতে পারিতেন, কিন্তু সেলিনার প্রাণ তদ্রূপ ছিল না। তিনি শৈশবেই তাঁহার জীবন ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণের ভিতর অবিশ্রান্ত ধর্ম্মতৃষ্ণা জ্বলিতেছিল। সেখানে বিলাসিতার

লেশমাত্রও ছিল না। ডনিংটনে আসিয়া তিনি স্থির করিলেন, পৃথিবীর এবং ভগবানের কাছে তাঁহার যে কর্ত্তব্য আছে, এখন হইতে যথাসাধ্য রূপে তাহা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিবেন। এই সময়ে তাঁহার ধর্ম্ম-পরায়ণা ননদিনী লেডি মারগেরেট্ হেষ্টিংস্ ও লেডি বেটি হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাইয়া সেলিনার প্রাণে এত দিন যে বহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, তাহা জ্বলিয়া উঠিল। প্রচার-ব্রতে ব্রতী হইবার জন্য তিনি বড়ই ব্যাকুল হইলেন; কিন্তু হঠাৎ কোন কঠিন রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার সকল আশা ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি যে রোগে আক্রান্ত হইলেন, তাহাতে তিনি যে আর বাঁচিবেন, এমন সম্ভব ছিল না। তিনিও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—এই অসময়ে যদি আমি মারা যাই, তবে আমি পরমেশ্বরের কাছে গিয়া কি জবাব দিব? আমি যে বিন্দু পরিমাণেও আমার জীবনকে প্রস্তুত করি নাই। সংসারের প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য আছে, তাহার একটীও যে প্রতিপালন করি নাই। হায়! আমি তাঁহার কাছে কি হিসাব দিব?” সেলিনা আপনার পরিণাম ভাবিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু দীনদয়াল ভগবান্ অবশেষে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই রোগমুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক জন ও চার্লস্ ওয়েস্‌লি নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে প্রচারার্থ আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, সেলিনা নিরতিশয় সুখী হইলেন এবং তাঁহাদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন—“আমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর নামে জীবনোৎসর্গ করিব। আপনারা আমার সহায় হউন।” সেলিনার স্বামীর

পরিজনবর্গ এই কথা শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং তিনি যে এই কথা প্রকাশ করিয়া বাতুলতার পরিচয় দিতেছেন, তাহাও থিওফিলাসকে বুঝাইয়া দিলেন। চারিদিক হইতে নানা জনে নানাপ্রকার বাধা দিতে লাগিল, কিন্তু সেলিনা কাহারও কথা গ্রাহ্য না করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যে খানে দৈবশক্তি অবতীর্ণ হয়, সেখানে সংসারের কোন বাধা-বিঘ্নই দাঁড়াইতে পারে না। সেলিনা স্বর্গীয় প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাণ মন ঢালিয়া খাটিতে লাগিলেন। লোকের নিন্দা, ভ্রূকুটি ও তিরস্কারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার উপাসনার প্রতি অনুরাগ, পাপীর প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ও জ্ঞানানুশীলনে বিশেষ যত্নের পরিচয় পাইয়া ইংলণ্ডবাসী মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কিন্তু ভগবানের কি বিচিত্র বিধান! যে তাঁহার দিকে অগ্রসর হয়, তিনি তাঁহাকেই নানাবিধ বিপদে ফেলিয়া বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া লন। কিছু দিনের মধ্যেই সেলিনার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। প্রচার-ব্রত গ্রহণের অব্যবহিত পরেই, জর্জ্জ এবং ফার্ণাণ্ডো নামক তাঁহার দুইটী পুত্র দুরারোগ্য বসন্তরোগে ইহলোক পরিত্যাগ করে। জর্জ্জের বয়স তের, এবং ফার্ণাণ্ডোর বয়স এগার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ইহাদের উপর সেলিনার অনেক আশা ভরসা ছিল। কিন্তু যাঁহার ধন তিনি লইয়া গেলে সেলিনা কি করিতে পারেন? এই দুর্ঘটনার অল্পদিন পরেই, ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর তারিখে, তাঁহার প্রিয়তম স্বামীও পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে প্রাণ ত্যাগ করেন। এই সময় সেলিনার বয়স ৩৯ বৎসর। দুঃখের বিষয়, ইহাদের শোকে এবং নানাবিধ দুশ্চিন্তায় তিনিও কঠিন রোগাক্রান্ত হন্। কিন্তু এই শোক ও দুঃখের আতিশয্যে তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট

হন নাই। বরং ইহার মধ্যে সেই বিশ্বজননীর মঙ্গল হস্ত দেখিয়া তিনি জীবন-পথে অগ্রসর হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে, তিনি ডাক্তার ডড্রিজ্‌কে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার ধর্ম্মভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সেই চিঠিখানি হইতে কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিতেছি; তিনি লিখিয়াছিলেন—"সংসারের গুরু ভারে দেহ মন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কবে আমার প্রাণে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে, কবে আমি তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ধধূপের ন্যায় সবেগে ছুটিয়া চলিব, কবে আমি প্রভুর সুসমাচার যথা তথা কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইব? আমি সেই শুভ দিনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। যাহাতে আমি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমার ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারি, আপনারা তজ্জন্য পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করুন।" ১৭৬৩ সালের মে মাসে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যাটীও ছাব্বিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। সেলিনা ইঁহাকে এত ভাল বাসিতেন যে, একবারও চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। তিনি আদর করিয়া তাঁহাকে "নয়নতারা" এবং "চিত্ততোষিনী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কন্যাও মায়ের মত ধর্ম্মানুরক্তা ছিলেন এবং মায়ের সমস্ত কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। মৃত্যুর সময় তিনি সেলিনার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"মা! তুমি কাঁদিও না। এত দিন আমি যে সুন্দর ছবি দেখিবার জন্য ব্যাকুল ছিলাম, আজ তাহাই দেখিতে যাইতেছি। তোমরা তাঁহার নামে জয়ধ্বনি কর।" ধৈর্য্যশীলা সেলিনা এমন পুণ্যবতী দুহিতাকে হারাইয়াও অটল অচল ভাবে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহার পর, তাঁহার ধর্ম্মতৃষ্ণা এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি

দিবানিশি কেবল ধর্ম্মালোচনাই করিতেন। সময় ও সুবিধা পাইলেই গরীব দুঃখীর দুঃখ মোচন করিবার জন্য সাতিশয় যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। ক্রমে যখন তাঁহার প্রাণ ধর্ম্মভাবে মত্ত হইল, তখন সাংসারিক সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, সামাজিক রীতি নীতি, উপাসনা-পদ্ধতি প্রভৃতির সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টীয় সমাজ সংস্কারের জন্য তিনি যে রূপ খাটিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অনুকরণীয় হইলেও বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকার নিকট তাহা তাদৃশ প্রীতিকর না হইতে পারে, এই বিবেচনা করিয়া আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম না। তিনি যদিচ খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন এবং তাঁহার কোন কোন মতের সহিত আমাদের মতের মিল হয় না, তথাপি তিনি যে জীবনের সমস্ত সুখ-স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মের জন্য অসাধারণ ব্যাকুলতা এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া সকলেরই নমস্য হইয়াছেন, তাঁহার কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই।

১৭৯১ সালের ১৭ই জুন তারিখে তিনি দেহত্যাগ করিয়া দিব্য-ধামে যাত্রা করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে আত্মীয় ও বন্ধুবর্গকে দুঃখ করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"তোমরা কেন দুঃখ করিতেছ? আমি বিশ্বরাজের কোলেই রহিয়াছি। চারি দিকে আমি তাঁহারই জয়ধ্বনি শুনিয়া কৃতার্থ হইতেছি। তোমরা বিশ্বাস ও অনুভব কর—পরলোক অতি মনোহর। তাহাই আমাদের বাড়ী। বাড়ী যাইতে ভয় কি? তোমরা আমাকে পিতার কাছে যাইতে দেখিয়া সুখী হও। অবিশ্বাসীর ন্যায় দুঃখ করিতেছ কেন? জয়, পিতারই জয়।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ নীরব হইল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই দেহপিঞ্জর শূণ্য হইল। প্রায় ৯৭ বৎসর গত হইল, সেলিনা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইংলণ্ডের, বিশেষতঃ মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা শীঘ্র পূর্ণ হইবার নয়।

সুসানা ওয়েস্‌লি।

সুসানার পিতা ডাক্তার এনেস্‌লি, প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর, পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশটী সন্তান। তন্মধ্যে সুসানা সর্ব্ব-কনিষ্ঠা। সুসানা ডাক্তার এনেস্‌লির দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। সুসানার মাতা দয়া, ধর্ম্ম ও ন্যায়-পরায়ণতার জন্য সর্ব্ব সাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসার পাত্রী ছিলেন। ১৮৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখে সুসানা জন্মগ্রহণ করেন। ডাক্তার এনেস্‌লির এই চব্বিশটী সন্তানের মধ্যে অধিকাংশই কন্যা। শৈশব হইতেই সুসানার দৈনন্দিনলিপি লিখিবার অভ্যাস ছিল। সেই বাল্যবৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, প্রচুর জ্ঞান-পিপাসা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। শৈশব কালে তিনি ফরাসী ভাষা এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কিছু কাল পরে তিনি যে ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন, নানা প্রকারে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। শৈশব জীবনেই তাঁহার ধর্ম্মভাবের বিশেষ পরিচয় পাইয়া তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে প্রচলিত রীতি অনুসারে

সুসনা ওয়েস্লি।

খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ক্রমে বিশেষ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৭০০ সাল হইতে তিনি প্রতিদিন ধর্ম্মচিন্তা করিবার জন্য নির্জ্জনে দুই ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিতেন। এই নির্জ্জন-সাধন তিনি কখনও বন্ধ করেন নাই।

সুসানা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন অন্যান্য গ্রন্থ ছাড়িয়া দিবানিশি কেবল ধর্ম্ম পুস্তকই পাঠ করিতেন। জেরিমি টেইলার (Jeremy Taylor) এবং বানিয়ানের (Buniyan) গ্রন্থাবলী অতীব যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। ইহার কিছুকাল পরে এরিয়ান্ এবং সোসিনিয়ান * (Arian and Socinian) সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মতৃষ্ণা নিরতিশয় প্রবল হয়। এই সোসিনিয়ান সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে গিয়া তৎসম্প্রদায়ভুক্ত সেমূয়েল ওয়েস্‌লি নামক এক ধার্ম্মিক যুবার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সেমূয়েল লাটিন ভাষায় লিখিত নানাবিধ গ্রন্থ অনুবাদ করিতেন এবং উল্লিখিত সম্প্রদায়ের নিকট হইতে যৎসামান্য বেতন পাইতেন। সেমূয়েলের প্রাণও দয়াধর্ম্মে মণ্ডিত ছিল। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, সংসারের যাবতীয় সুখ লালসা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে ইনি সোসিনিয়ানী ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে সুসানার সহিত ইহার প্রণয় হয়; এবং এই প্রণয়ের ফলে উভয়েই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। ১৬৯০ সালে উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিবাহ সময়ে সেমূয়েল ওয়েস্‌লির পঞ্চবিংশতি মুদ্রা মাত্র মাসিক আয় ছিল। এই নবদম্পতির

* এরিয়ান্ সম্প্রদায় চতুর্থ শতাব্দীতে এবং সোসিনিয়ান সম্প্রদায় ষোড়শ শতাব্দীতে খ্রীষ্টের ঐশ্বরিকত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন।

ধনলালসা ছিল না বলিলেই হয়। সুসানা, স্বামী দরিদ্র বলিয়া কখনও দুঃখিত হন নাই। তিনি স্বামীর ধর্ম্মানুরাগ,সচ্চরিত্র ও প্রেমের প্রভাবেই মুগ্ধ ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে কোন কোন ধনী যুবকের সহিতও পরিণীতা হইতে পারিতেন, কিন্তু সুসানা তেমন মেয়ে ছিলেন না। তিনি জানিতেন, ধর্ম্মধনের তুল্য এ সংসারে কোন ধনই নহে! তাই যোগ্যপাত্রে পরিণীতা হইতে বিন্দু মাত্রও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। বিবাহের পর কিছু কাল ইঁহারা লণ্ডনেই অবস্থিতি করেন। পরে এপ্‌ওয়ার্থ নামক কোন পল্লীর ধর্ম্ম-প্রচারকের পদ লাভ করিয়া এই স্থান পরিত্যাগ করেন। সেমুয়েল যে যৎসামান্য বেতন পাইতেন, তাহাতে তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ই নির্ব্বাহিত হইত না। তজ্জন্য তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচার ব্যতীত অন্য প্রকারেও বিশেষ রূপে খাটিতে হইত। তিনি একটুকু অবসর পাইলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া প্রকাশ করিতেন। তাহাতেও কিছু কিছু আয় হইত। ১৬৯৬ সালে তিনি মহর্ষি ঈশার এক খানি সচিত্র জীবনী প্রকাশ করেন। এই সুন্দর গ্রন্থখানি মহারাণীর নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই পুস্তক প্রচারের কিয়দ্দিন পরেই সেমুয়েল,মহারাণীর বিশেষ অভিপ্রায়ানুসারে,অপেক্ষাকৃত উচ্চ পদে আরূঢ় হন্।

এপওয়ার্থ-বাসী নরনারীগণ অতীব দুর্নীতিপরায়ণ। তাহারা সহজে কাহারও সৎ পরামর্শ গ্রহণ করিতে চায় না। নিরীহ ধর্ম্মপরায়ণ নরনারীর উপর অত্যাচার করা তাহাদের স্বভাব সিদ্ধ কার্য্য। ধর্ম্মশীল ওয়েস্‌লিদম্পতি যখন এই পল্লীতে আগমন করিলেন, তখনও তাহারা পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় নাই। দুঃখের বিষয় পল্লীতে যে সকল নিম্ন শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী এবং শান্তিরক্ষক বাস করিত, তাহারাও এই দুর্নীতিপরায়ণ নরনারীর মন্দাভি-

প্রায়ের সাহায্য করিতে একটুকুও সঙ্কুচিত হইত না। এই ভীষণ স্থানে আগমন করিয়া সেমূয়েল ও সুসানা পদে পদে অত্যাচরিত, লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা উপদেশ দিতেন বটে, কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদন মাত্র। সেই সব পাষণ্ড তাহার প্রতি-দানে সুরাপান করিয়া তাঁহাদের গৃহে ঢিল ছুড়িত ও অগ্নি প্রয়োগ করিত। তথাপি তাঁহারা অক্ষুণ্ণ চিত্তে ও নীরবে আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতেন। তাঁহাদের বাসের জন্য যে গৃহখানি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা অতীব জীর্ণ। গৃহখানি যদিচ দ্বিতল, কিন্তু উপরে খড়ের ছাউনি থাকায় দুই তিনবার আগুন লাগে। শেষ বারে পাষণ্ডগণ যে অগ্নি প্রয়োগ করে, তাহাতে সেমূয়েলের একেবারে সর্ব্বনাশ হয়। গভীর নিশীথে চালের উপর যখন আগুণ জ্বলিয়া উঠিল, তখন সুসানা তিন চারিটী সন্তানকে লইয়া কোন প্রকারে গৃহ হইতে বাহির হইলেন; কিন্তু অপর একটী বালক দ্বিতল গৃহে নিদ্রিত থাকায় সেমূয়েল তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কিছুতেই আসিতে পারিলেন না। তিনি তখন নীচে ছিলেন। তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য যেমন উপরে উঠিতে যাইবেন, অমনি দেখিলেন সিঁড়ি খানিও জ্বলিয়া উঠিয়াছে। উপরে ও নীচে আগুণ দাউ দাউ করিয়া উঠিয়াছে। হায়! হতভাগ্য বালক জীবিতাবস্থায়ই কি দগ্ধীভূত হইবে? সেমূয়েল এই ভাবিয়া একেবারে অস্থির হইয়া সেই জ্বলন্ত সিঁড়ির উপর দিয়া যেমন উঠিতে যাইবেন, অমনি সিঁড়িটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। তখন ঘরের চারিদিকে আগুণ হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। গৃহের তৈজসপত্র এবং দেয়ালেও আগুন ধরিল। মেঝে গরম হইয়া উঠিল, সেমূয়েল আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। "দয়াময় হতভাগ্য বালককে রক্ষা কর" এই বলিয়া গৃহ হইতে লম্ফ

প্রদান করিয়া বাহির হইলেন। তখন সেই বালক ঘুম হইতে উঠিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া কাতরপ্রাণে সকলকে ডাকিতেছিল। কিন্তু কেহই তাহাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইল না। যাহারা অগ্নি প্রদান করিয়াছিল, তাহারাও কৌতুক দেখিবার জন্য সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। ভগবানের কি বিচিত্র লীলা, সেই পাষণ্ডগণ বালকের পরিণাম ভাবিয়া যথেষ্ট পরিমাণে অনুতপ্ত হইল, এবং ক্রমান্বয়ে একজনের কাঁধে অপর ব্যক্তি দাঁড়াইয়া সেই বালককে উদ্ধার করিল! ভগবান্ যাহাকে রক্ষা করেন, তাহাকে কে মারিতে পারে? বালকের যখন উদ্ধার হইল, তখন সেমূয়েল ও সুসানা সেই দুর্দ্দান্ত প্রতিবেশীমণ্ডলীকে কাতরবাক্যে বলিলেন—"আমাদের সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হউক, তাহাতে দুঃখ নাই। ভগবান্ আজ আমাদের যে ধন রক্ষা করিলেন, তোমরা তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও।" সেই মুহূর্ত্তেই সেই দুর্দ্দান্ত পাষণ্ড-গণের মধ্যে বসিয়া সেমূয়েল স্ত্রী পুত্র লইয়া মুদিত নয়নে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রতিবেশীদের আত্মার কল্যাণার্থ প্রার্থনা করিলেন। "বাম গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে, দক্ষিণ গণ্ড ফিরাইয়া দিও" সেমূয়েল ও সুসানা মহর্ষি ঈশার এই উপদেশ-রত্ন ভুলিয়া যান্ নাই। যাহারা তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিল, তাঁহারা তাহাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিলেন! এই সংসারে প্রেমের এমন সুন্দর ছবি কয়টি দেখিতে পাওয়া যায়? যে বালক এই ভীষণ অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার পাইল, এই বালকই পরে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক জন্ ওয়েস্‌লি নামে ইয়ুরোপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,আগুণ লাগিলে এক কপর্দ্দকও সুসানার গৃহ হইতে বহির্গত হয় নাই। পরে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য সেমূয়েল ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়েন। যথাকালে সেই ঋণ শোধ করিতে না পারায়,

উত্তমর্ণগণ রাজকর্ম্মচারীদের উত্তেজনায় অভিযোগ উপস্থিত করিল। ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া সেমূয়েল কারাগারে প্রেরিত হইলেন। সুসানা কয়েকটী অপোগণ্ড শিশু লইয়া সংসার পাথারে ভাসিলেন। তিনি কোন প্রকারে আপনার ও সন্তানবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই বিপদে পতিত হইয়া ওয়েস্‌লিদম্পতি ক্ষণেকের জন্যও ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহাদের প্রার্থনাই সম্বল ছিল। দুঃখে ও শোকে অবিশ্রান্ত কেবল ভগবানের নামোচ্চারণই করিতেন। সেমূয়েল কারাগারে গিয়াও আপন কার্য্যে নিবৃত্ত ছিলেন না। তিনি অপরাপর কারাবাসীকে "পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং এই "পাখীদের" আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতি সাধনের জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বামীর দুঃখে সুসানা সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ ছিলেন। তাঁহার হাতে আর এক কপর্দ্দকও ছিলনা যে, স্বামীর সাহায্যার্থ কিছু দিতে পারেন। অবশেষে একমাত্র ধন একটী (বিবাহোপহার) স্বর্ণাঙ্গুরীয় ছিল, তাহাই স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সেমূয়েল অঙ্গুরীয় ফিরাইয়া দিয়া বাহকের নিকট বলিয়া দিলেন—"সুসানাকে বলিও আমার জন্য তিনি যেন চিন্তিত না হন! পাখীরা বীজ বপন না করিয়াও যাঁহার কৃপায় খাইতে পায়, আমিও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইব না।"

সেমূয়েলকে কারাগারে দিয়া শত্রু পক্ষের আনন্দের সীমা নাই। এখন তাহারা দুঃখিনী অসহায়া সুসনার উপরে অত্যাচার করিতে লাগিল। সুসানা অম্লান বদনে সমস্ত সহ্য করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বৃত্তগণ প্রতি রাত্রে তাঁহার কুটীরের সম্মুখে আসিয়া নানা প্রকারে অত্যাচার করিত। ইহাদের গোলমালে তিনি সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও চক্ষু মুদিতে পারিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের উপরে

বিন্দুমাত্রও বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতেন না। বরং তাহাদের পাপ বিমোচনার্থ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেন। সেলিনা আপন জননীর ন্যায় অনেকগুলি সন্তানের মা হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী লেখক রেভারেণ্ড জেমস্ ক্যানিংহাম সাহেব বলেন, তিনি ১৮।১৯টী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। সমস্ত সন্তানকে নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন না বলিয়া এক জন ধাত্রী রাখিয়াছিলেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তানটী প্রায়ই এই ধাত্রীর নিকটে থাকিত। প্রতিবেশীদের অত্যাচারে ক্রমান্বয়ে দুই তিন রাত্রি জাগরণের পর এক দিন ধাত্রী একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। ধাত্রীর অসতর্কতায় শিশুটী তাহার চাপে পড়িয়া সেই রাত্রে মরিয়া গেল। পরদিন সেলিনা সন্তানের অকাল মৃত্যুতে নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন বটে, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা মনে করিয়া শোক ও সন্তাপ প্রকাশ করিতে বিরত রহিলেন।

তিনি বহুসন্তানবতী হইয়াও বিশেষ নিষ্ঠার সহিত পুত্র কন্যার শিক্ষা দান করিতেন। তাঁহার শিক্ষা প্রণালী বড়ই সুন্দর ছিল। তিনি পাঁচ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে বালক বালিকাদিগকে বর্ণ শিক্ষা দিতেন না। বিদ্যালয়ে বালক বালিকা প্রেরণ করা তাঁহার সম্পূর্ণ মত বিরুদ্ধ ছিল। সন্তানগণ অপরাপর দুর্নীতিপরায়ণ বালক বালিকার সহিত মিশিয়া যে অনেক সময় অধঃপতিত হয়, তিনি তাহার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাইয়াই বাড়ীতে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি বাড়ীতে যে রূপ শিক্ষা দিতেন, তাহা তুলনায় বিদ্যালয় হইতে উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। শারীরিক শাস্তিতে বালক বালিকারা দোষ গোপন করিতে শিখে বলিয়া কাহাকেও শারীরিক শাস্তি দিতেন না। কেহ কোন অপরাধ করিলে তিনি এমন মিষ্ট ভাষায় তাহার দোষের কথা বুঝাইয়া দিতেন যে, তখনি সে স্বয়ং

সংশোধন না করিয়া এবং ক্ষমা না চাহিয়া স্থির থাকিতে পারিত না। তাঁহার শিক্ষাগুণে অধিকাংশ সন্তানই সচ্চরিত্র, সুবোধ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছিল। তন্মধ্যে জন ওয়েস্লিই উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শিক্ষা ধর্ম্মহীন ছিল না। তিনি বলিতেন,—"যে শিক্ষার মূলে ধর্ম্ম বা ঈশ্বরভক্তি নাই, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।" তিনি প্রতিদিন ভগবানের নাম না করাইয়া কোন সন্তানকে কোন কার্য্যে হাত দিতে দিতেন না। তাহাদের অঙ্গ চালনার জন্য তিনি প্রতিদিন কিছু সময় ব্যায়াম ও ছুটোছুটি করিয়া খেলা করিতে অনুমতি করিতেন। তিনি সন্তানগণের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সমভাবে রাখিয়াছিলেন।

কিছু কাল পরে ওয়েস্‌লিদম্পতি অর্থকষ্টে পতিত হন। কিন্তু তজ্জন্য কখনও অপরের দ্বারস্থ হন্ নাই। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, পরমেশ্বরই সমস্ত অভাব মোচন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া যখন চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইল, তখন ওয়েস্‌লির জনৈক ধনবান ভ্রাতা সুসানাকে শ্লেষ ভাবে বলিয়াছিলেন—"তোমরা এই প্রচার-ব্রত পরিত্যাগ কর, আমি অর্থ দিব।" সেই কথা শুনিয়া সুসানা তীব্র ভাবে বলিয়াছিলেন—"আমরা আপনার অর্থ চাই না। যে পবিত্র ব্রত লইয়া আমাদের এই মলিন জীবন ধন্য হইয়াছে, তাহা কোন্ প্রাণে ছাড়িব? ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, আমরা অনাহারে মরিব। তাই বলিয়া কি ধর্ম্মের মাথায় পদাঘাত করিয়া বিষয় ভোগে মত্ত হইব?" সেমুয়েল সুসানার এই তেজোময় বাক্য শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

সুসানাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহার সন্তানগণ কোন কার্য্য করিত না। তিনি বলিতেন—"ছেলে মেয়ের এমন কি কাজ থাকিতে পারে, যাহা মাকে না জানাইয়া করিতে পারে?" তাঁহার শিক্ষাগুণে জন্ ওয়েস্‌লির প্রাণ ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। জন্ যখন প্রচার-ব্রত গ্রহণ করেন, তখন সুসানা যে প্রাণোন্মাদ-কারী উপদেশটী দিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া ভজনালয়স্থ তাবৎ নরনারী যেমন কাঁদিয়াছিল, তিনিও তেমনি কাঁদিয়াছিলেন!

১৭২৪ সালে সেমুয়েলের মাসিক আয় প্রায় শতাধিক মুদ্রা হইল।

আর্থিক কষ্ট কতক পরিমাণে বিদূরিত হইল বটে, কিন্তু সুসানার সে সুখ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। ১৭৩৫ সালের ২৫শে এপ্রিল তারিখে বায়াত্তর বৎসর বয়সে সেমূয়েল ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সেমুয়েলের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জন্ ও চার্লস্ আমেরিকায় ধর্ম্ম প্রচারে গমন করিলেন। তদ্ধেতু সুসানা তৃতীয় পুত্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে গাইনস্বার্গে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। জন ও চার্লস্ যত কাল আমেরিকায় ছিলেন, সুসানা প্রতিপত্রে তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ উৎসাহিত করিতেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাদিগকে বলিতেন,—"তোমরা যদি ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পরিত্যাগও কর, তথাপি আমি আনন্দিত হইব।" ইহার পর জন্ ও চার্লস দেশে প্রত্যাগত হইলে, তিনি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া নানাবিধ সদানুষ্ঠান করেন। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। অবশেষে পীড়িতাবস্থায় মুরফিল্ডে আসিয়া অবস্থিতি করেন। এই স্থানে আসার পর পীড়া ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। চিকিৎসকের চিকিৎসা পরাভূত হইল। সকলে নিরুপায় হইয়া সেই ভীষণ দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সুসানা রোগশয্যায় শায়িত হইয়া অনবরত কেবল ভগবানের নামোচ্চারণ করিতেন।

অবশেষে আসন্নকাল উপস্থিত হইল। সেই সময় দুই হাত যোড় করিয়া বলিলেন—"প্রভো! তুমি তোমার দাসীকে লইতে আসিয়াছ? এই যে আমি প্রস্তুত।" আর কথা বাহির হইল না। কেবল একবার মাত্র অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিলেন—"আমার প্রাণ বাহির হইবা মাত্র তোমরা একটী ধর্ম্মসঙ্গীত কীর্ত্তন করিও।" ১৭৪২ সালের ২৩শে জুলাই তারিখে ধীরে ধীরে সুসানার প্রাণ আনন্দধামে চলিয়া গেল। সুসানার পার্থিব দেহ বিনষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু যতকাল এ পৃথিবীতে গুণের আদর থাকিবে, তত কাল ইউরোপবাসী এই মনস্বিনী ধর্ম্মশীলা দেববালাকে ভুলিতে পারিবে না।

সমাপ্ত।